তিন গোয়েন্দা

# হারানো তিমি

রকিব হাসান

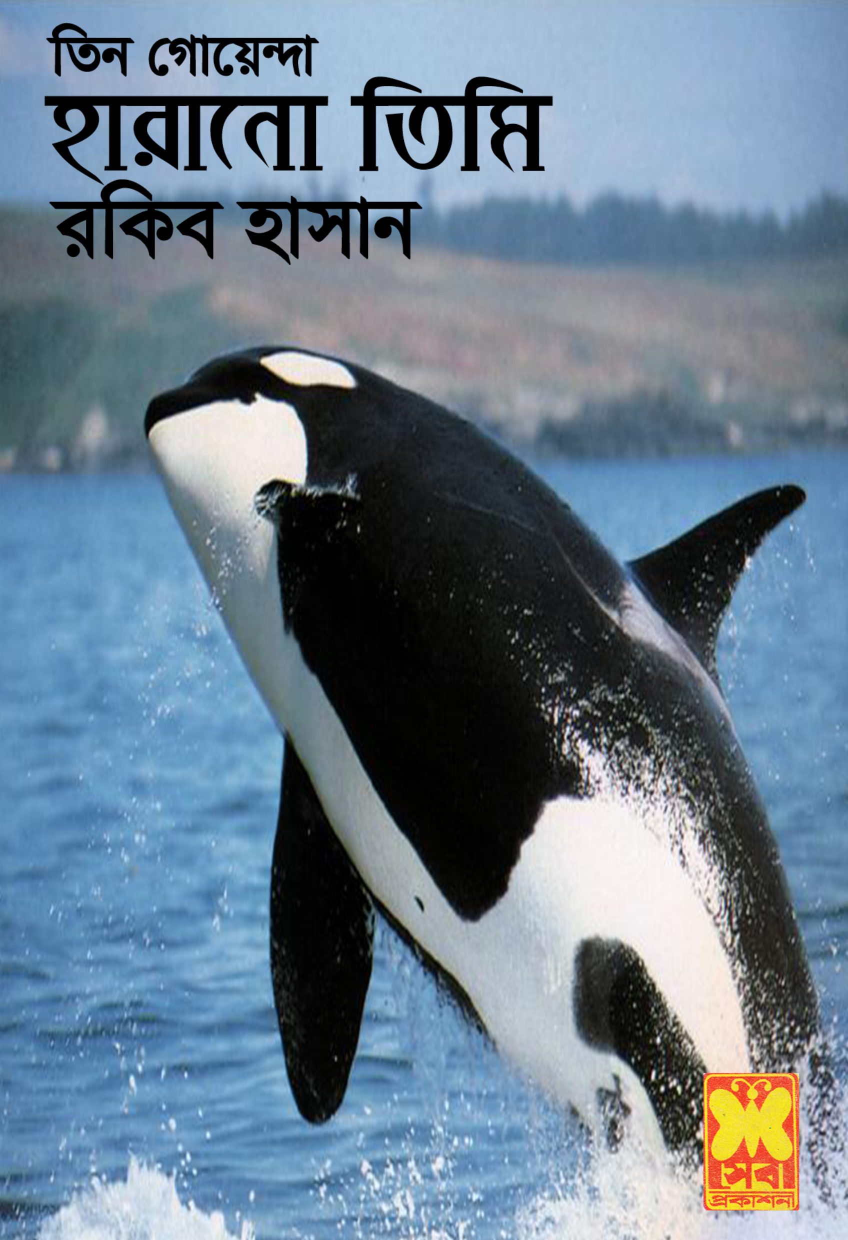

সেবা প্রকাশনী

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

BANGLAPDFBOI.COM

# হারানো তিমি

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

'ওই যে, তিমির ফোয়ারা!' চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত রবিন। 'আরে দেখছ না, ওই যে···ওইই,' সাগরের দিকে হাত তুলে দেখাল সে।

এইবার দেখল মুসা। ঠিকই। তীর থেকে মাইল তিন-চার দূরে ভেসে উঠেছে যেন ছোটখাট এক দ্বীপ, পানির ফোয়ারা ছিটাচ্ছে। মিনিটখানেক এদিক ওদিক পানি ছিটিয়ে ডুবে গেল আবার ধূসর মস্ত জীবটা।

সৈকতের ধারে উঁচু পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা ঃ কিশোর পাশা, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড। আবার এসেছে বসন্ত, স্কুল ছুটি। এই ছুটিতে তিমির ওপর গবেষণা চালাবে ওরা, ঠিক করেছে। খুব ভোরে তাই সাইকেল নিয়ে ছুটে এসেছে সাগর পারে, তিমির যাওয়া দেখার জন্যে।

প্রতি বছরই ফেব্রুয়ারির এই সময়ে আলাসকা আর মেকসিকো থেকে আসে তিমিরা, হাজারে হাজারে, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ধরে চলে যায়, যাওয়ার পথে থামে একবার বাজা ক্যালিফোর্নিয়ায়। মেয়েরা বাচ্চা দেয় ল্যাগুনের উষ্ণ পানিতে, পুরুষেরা বিশ্রাম নেয়।

কয়েক হপ্তা পর বাচ্চারা একটু বড় হলে আবার বেরিয়ে পড়ে ওরা। এবার আর থামাথামি নেই, একটানা চলা। প্রায় পাঁচ হাজার মাইল সাগরপথ পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছায় উত্তর মেরুসাগরে। গরমের সময় ওখানকার পানি ছেয়ে থাকে খুদে চিংড়ি আর প্ল্যাঙ্কটনে, ধূসর তিমির প্রিয় খাবার।

'যাওয়ার সময় সবাই দেখে ওদেরকে,' বলল রবিন, 'কিন্তু ফেরার সময় দেখে না।' আগের দিন রকি বীচ লাইব্রেরিতে তিমির ওপর পড়াশোনা করে কাটিয়েছে সে। যা যা গিলেছে সেগুলো উগড়াচ্ছে এখন।

'কেন?' জানতে চাইল মুসা।

'ফেরার পথে হদিস রাখা যায় না বোধহয়,' হাতের খোলা নোটবুকের দিকে তাকাল আরেকবার রবিন। 'যাওয়ার সময় দল বেঁধে যায় ওরা, সবার চোখে পড়ে। ফেরার পথে বড় একটা পড়ে না, হয়তো একা একা ফেরে বলে। কারও কারও মতে ফেরে একা নয়, জোড়ায় জোড়ায়। তাহলেও বিশাল সাগরে দুটো তিমির পেছনে কে কতক্ষণ লেগে থাকতে পারবে? পথ তো কম নয়, হাজার হাজার মাইলের ধাক্কা।'

'তা ঠিক,' সায় দিল মুসা। 'কিশোর, তোমার কি মনে হয়?'

কিন্তু ওদের কথায় কান নেই গোয়েন্দাপ্রধানের। দূরে সাগরের যেখানে তিমির ফোয়ারা দেখা গেছে, সেদিকেও চোখ নেই। সে তাকিয়ে আছে নিচের নির্জন

সৈকতের একটা অগভীর খাঁড়ির দিকে। আগের দিন রাতে ঝড় হয়েছিল, ঢেউ নানারকম জঞ্জাল—ভাসমান কাঠের গুঁড়ি, প্ল্যাসটিকের টুকরো, খাবারের খালি টিন, উপড়ানো আগাছা, শেওলা, আরও নানারকম টুকিটাকি জিনিস এনে ফেলেছে খাঁড়িতে।

'কি যেন একটা নড়ছে,' বলে উঠল কিশোর। 'চলো তো, দেখি।' কারও জবাবের অপেক্ষা না করেই ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে। তাকে অনুসরণ করল অন্য দুজন।

ভাটা শুরু হয়েছে, ইতিমধ্যেই অর্ধেক নেমে গেছে পানি। খাঁড়ির কাছে এসে থামল কিশোর, আঙুল তুলে দেখাল।

'আরে তিমি!' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আটকে গেছে। সাহায্য না পেলে মরবে।'

তাড়াতাড়ি জুতো-মোজা খুলে নিল তিনজনে। শুকনো বালিতে রেখে, প্যান্ট গুটিয়ে এসে নামল কাদাপানিতে।

ছোট্ট একটা তিমি, মাত্র ফুট সাতেক লম্বা। বাচ্চা তো, তাই এত ছোট—ভাবল রবিন। ঝড়ের সময় কোনভাবে মায়ের কাছছাড়া হয়ে পড়েছিল, ঢেউয়ের ধাক্কায় এসে আটকা পড়েছে চরায়।

সৈকত এখানে বেশ ঢালু, ফলে খুব দ্রুত নামছে পানি। ওরা তিমিটার কাছে আসতে আসতেই গোড়ালি পর্যন্ত নেমে গেল পানি। এতে সুবিধেই হলো ওদের। বেশি পানি হলে অসুবিধে হত, ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে, বরফ-শীতল পানি। তবে পানি কমে যাওয়ায় বাচ্চাটা পড়ল বিপদে, সাগরে নামতে পারছে না।

তিনজনে মিলে গায়ের জোরে ঠেলা-ধাক্কা দিল, কিন্তু নড়াতে পারল না ওটাকে। হাজার হোক তিমির বাচ্চা তো, যত ছোটই হোক, মানুষের জন্যে বেজায় ভারি। তিরিশ মণের কম না, ভাবল কিশোর। বান মাছের মত পিচ্ছিল শরীর, হাত পিছলে যায়। তার ওপর না ধরা যাচ্ছে পাখনা, না লেজ, কিছু ধরে টেনেটুনে যে সরাবে তারও উপায় নেই। বেশি জোরে টানাটানি করতেও ভয় পাচ্ছে, কি জানি কোথাও যদি আবার ব্যথা পায় তিমির বাচ্চা।

ওদের মোটেও ভয় পাচ্ছে না বাচ্চাটা, যেন বুঝতে পেরেছে, ওকে সাহায্য করারই চেষ্টা হচ্ছে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছে ওদেরকে। কথা বলতে পারলে বুঝি বলেই উঠত ঃ মারো জোয়ান হেঁইও, জোরসে মারো হেঁইও।

রবিন এসে দাঁড়াল মাথার কাছে। বিশাল মাথা ধরে ঠেলার চেষ্টা করতে গিয়েই খেয়াল করল, ফোয়ারার ছিদ্রটা অন্যরকম। ভুল ভেবেছে এতক্ষণ। বাচ্চা তিমি না এটা।

কিশোর আর মুসাকে কথাটা বলতে যাবে, এই সময় বিশাল এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল, এক ধাক্কায় চিত করে ফেলল ওদেরকে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে আবার খাড়া হলো ওরা, ততক্ষণে চলে গেছে পানি। ঢেউ আসার আগে গোড়ালি অবধি ছিল, সেটা কমে গিয়ে হয়েছে বুড়ো আঙুল সমান। খাঁড়ি থেকে উঠে তিমিটা গিয়ে আরও খারাপ জায়গায় আটকেছে, সৈকতের বালিতে। খাঁড়িতে যা হোক কিছু পানি

আছে, ওখানে তা-ও নেই।

'মরছে,' বলে উঠল মুসা। 'এবার আরও ভালমত আটকাল। জোয়ার আসতে আসতে কর্ম খতম।'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন। 'হ্যাঁ,আরও অন্তত ছয় ঘণ্টা।'

'শুকনোয় এতক্ষণ বাঁচতে পারে তিমি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'মনে হয় না। পানি না পেলে খুব তাড়াতাড়ি ডি-হাইড্রেটেড হয়ে পড়ে ওদের শরীর, চামড়া শুকিয়ে খসখসে হয়ে যায়।'

ঝুঁকে বিশাল মাথাটায় আলতো চাপড় দিল রবিন, 'দুঃখ হচ্ছে তিমিটার জন্যে। পানিতে রাখতে হবে, নইলে বাঁচবে না।'

কথা বুঝতে পেরেই যেন ক্ষণিকের জন্যে চোখ মেলল তিমি। বিষণ্ণ হতাশা মাখা দৃষ্টি, রবিনের তা-ই মনে হলো। ধীরে ধীরে আবার চোখের পাতা বন্ধ করল তিমিটা।

'কিভাবে রাখব।' বলল মুসা, 'পানিতে যখন ছিল তখনই ঠেলে সরাতে পারিনি, আর এখানে তো খটখটে শুকনো।'

জবাব দিতে পারল না রবিন। কিশোরের দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলছে না গোয়েন্দাপ্রধান, তাদের আলোচনায় মন নেই।

গভীর চিন্তায় মগ্ন কিশোর, ঘন ঘন তার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। বিড়বিড় করল, 'পর্বতের কাছে যদি যাওয়া না যায় পর্বতকেই কাছে আনতে হবে।'

'আরে, এই কিশোর,' জোরে বলল মুসা, 'কি বলছ? ইংরেজী বলো, ইংরেজী বলো। এখানে কিসের পর্বত? আমরা পড়েছি তিমি-সমস্যায়।'

মাঝে মাঝে কঠিন শব্দ বলা কিংবা দুর্বোধ্য করে কথা বলা কিশোরের স্বভাব।

'তিমির কথাই তো বলছি।' সাগরে দেখাল কিশোর, 'ওই যে, পর্বত, ওটাকেই কাছে আসতে বাধ্য করতে হবে। একটা বেলচা দরকার। আর…আর একটা তারপুলিন। আর পুরানো একটা হ্যাণ্ড পাম্প, গত মাসে যেটা বাতিল মালের সঙ্গে কিনে এনেছে চাচা…'

'গর্ত,' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'গর্ত! কিসের গর্ত?' মুসা অবাক।

'একটা গর্ত খুঁড়ে, তাতে তারপুলিন বিছিয়ে পাম্প করে পানি দিয়ে ভরে দিতে হবে গর্তটা,' বলল কিশোর। 'ছোটখাট একটা সুইমিং পুল বানিয়ে দেব তিমিটার জন্যে, যতক্ষণ না জোয়ার আসে টিকে থাকতে পারবে।'

দ্রুত সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর ঠিক হলো, সাইকেল নিয়ে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসবে মুসা আর রবিন। ততক্ষণ তিমিটাকে পাহারা দেবে কিশোর।

মুসা, রবিন চলে গেল। কিশোর বসে রইল না। প্লাসটিকের একটা বাঁকাচোরা বাকেট খুঁজে আনল খাঁড়ি থেকে। হাত দিয়ে চেপেচুপে কোনমতে কিছুটা সোজা করে নিয়ে ওটাতে করে পানি এনে গায়ে ছিটাল তিমিটার।

পরের আধ ঘণ্টা পানি ছিটানোয় ব্যস্ত রইল কিশোর। রবিন আর মুসা যা করতে গেছে, তার চেয়ে কঠিন কাজ করতে হচ্ছে তাকে, সন্দেহ নেই। ঢালু ভেজা পাড় বেয়ে সাগরে নেমে পানি তুলে নিয়ে দৌড়ে ফিরে আসতে হচ্ছে. এতবড় একটা শরীর ভিজিয়ে রাখা সোজা কথা নয়। ছোট বাকেটে কতটুকুই বা পানি ধরে, তার ওপর তিমির চামড়া যেন মরুভূমির বালি, পানি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুঁষে নিচ্ছে।

গতর খাটাতে কোন সময়েই বিশেষ ভাল লাগে না কিশোরের। ঠেকায় পড়লে কাজ করে, তার চেয়ে মগজ খাটানো অনেক বেশি পছন্দ তার। 'ওই যে, এসে গেছে,' তিমিটাকে বলল সে।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল দুই সহকারী গোয়েন্দা। যা যা দরকার নিয়ে এসেছে। প্রায় নতুন একটা বেলচা, তারপুলিনের রোল, হ্যাণ্ড-পাম্প, হোস পাইপের কুণ্ডলী নামিয়ে রাখল বালিতে।

কিশোরও হাঁপাচ্ছে। বলল, 'ওটার গা ঘেঁষে গর্ত খুঁড়তে হবে। তারপর যে ভাবেই হোক ঠেলেঠুলে ফেলব গর্তে।' তিনজনের মাঝে গায়ে জোর বেশি মুসার, কায়িক পরিশ্রমেও অভ্যস্ত, বেলচাটা সে-ই আগে তুলে নিল। গর্তের বেশির ভাগটাই সে খুঁড়ল। ভেজা বালি. আলগা. খুঁড়তে বিশেষ বেগ পেতে হলো না, সময়ও লাগল না তেমন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দশ ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া আর তিন ফুট মত গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলল ওরা।

গর্তে তারপুলিন বিছিয়ে দিল ভালভাবে, চারপাশের দেয়ালও তারপুলিনে ঢাকা পড়ল, ফলে পানি শুঁষে নিতে পারবে না বালি। পাম্প নিয়ে সাগরের দিকে দৌড়াল মুসা। রবিন আর কিশোর হোস পাইপের কুণ্ডলী খুলল, পাম্পের সঙ্গে এক মাথা লাগিয়ে আরেক মাথা টেনে এনে ফেলল গর্তে। পাম্পটা বেশ ভাল, কোন মাছধরা নৌকায় পানি সেঁচার কাজে ব্যবহার হত হয়তো।

পালা করে পাম্প করে অল্পক্ষণেই গর্তটা পানি দিয়ে ভরে ফেলল ওরা।

'সব চেয়ে শক্ত কাজটা এবার,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

'আল্লাহ ভরসা,' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল মুসা। 'এসো ঠেলা লাগাই।'

'দাঁড়াও, একটু জিরিয়ে নিই,' ধপাস করে বালিতে বসে পড়ল কিশোর। 'আর কয়েক মিনিটে মরবে না।'

জিরিয়ে নিয়ে উঠল ওরা। ভারি পিপে ঠেলে গড়িয়ে নেয়ার ভঙ্গিতে তিমির গায়ে হাত রেখে দাঁড়াল কিশোর আর মুসা। মাথার কাছে চলে এল রবিন। তিমির মাথায় আলতো চাপড় দিল।

চোখ মেলল তিমি। রবিনের মনে হলো, তার দিকে চেয়ে হাসছে।

'ঠেলো বললেই ঠেলা লাগাবে। এক সঙ্গে...,' কিন্তু কিশোরের কথা শেষ হলো না। তার আগেই ভীষণভাবে নড়ে উঠল তিমি। বান মাছের মত মোচড় দিয়ে শরীর বাঁকিয়ে, বালিতে লেজের প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে পাশে সরে গেল. ঝপাত করে কাত হয়ে পড়ল পানিতে। পানি ছিটকে উঠল অনেক ওপরে।

তিমির গায়ে বেশি ভর দিয়ে ফেলেছিল মুসা. উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। চেঁচিয়ে উঠল, 'ইয়াল্লা!'

আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল রবিন।

হাতের তালু ঝাড়তে ঝাড়তে কিশোর বলল, 'যাক বাবা, বাঁচা গেল। নিজের কাজ নিজেই সেরে নিল।'

পুরো এক মিনিট পানিতে গা ডুবিয়ে রইল তিমি, মুখ দিয়ে পানি টানল, তারপর সামান্য ভেসে উঠে ফোয়ারা ছিটাল মাথার ফুটো দিয়ে, তিন গোয়েন্দার গা ভিজিয়ে দিয়ে যেন ধন্যবাদ জানাল।

ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল মুসা। 'ব্যাটা, আবার রসিকতা জানে…'

'যাক,' মুসার কথায় কান না দিয়ে বলল রবিন, 'জোয়ার আসাতক বেঁচে থাকতে পারবে।'

'জোয়ার তো সময়মত ঠিকই আসবে, আমাদেরও সময়মত যাওয়া দরকার,' বলল কিশোর। 'মনে নেই, আজ ইয়ার্ডে কাজ আছে? তাছাড়া নাস্তা…'

'যাহ্,' মুসা বলল, 'এক্কেবারে ভুলে গেছি! আপেলের বরফি আর মুরগীর রোস্ট খাওয়াবেন কথা দিয়েছেন মেরিচাচী! চলো, চলো।' তিমিটার দিকে ফিরল, 'হেই মিয়া, তুমি পানি খাও, আমরা যাই, মুরগী ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

মুসার কথায় সায় জানাতেই যেন আরেকবার তাদের গায়ে পানি ছিটাল তিমি।

গর্তের কিনারে এসে দাঁড়াল রবিন। তিমিটার উদ্দেশ্যে বলল, 'থাক। কোন অসুবিধে হবে না। আবার আসব আমরা।'

তাড়াহুড়ো করে জুতোমোজা পরে নিল তিনজনে। পাম্প, বেলচা আর হোসপাইপ গুছিয়ে নিয়ে এসে উঠল পাড়ের ওপর। মাটিতে শুইয়ে রাখা সাইকেলগুলো তুলে মাল বোঝাই করল। রওনা হতে যাবে, এই সময় একটা শব্দে ফিরে তাকাল কিশোর।

মাইল দুয়েক দূরে ছোট একটা জাহাজ—একটা কেবিন ক্রুজার, আউটবোর্ড মোটর—ধীরে ধীরে চলেছে। দুজন লোক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এত দূর থেকে চেহারা বোঝা গেল না।

হঠাৎ আলোর ঝিলিক দেখা গেল জাহাজ থেকে। পর পর তিনবার।

'আয়নার সাহায্যে সিগন্যাল দিচ্ছে,' বলল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমার মনে হয় না। যেভাবে ঝলকাচ্ছে, কোন নিয়মিত প্যাটার্ন নেই। অন্য কোন জিনিস, বোধহয় বিনকিউলারের কাঁচে রোদ লেগে প্রতিফলিত হচ্ছে।'

ব্যাপারটা অন্য দুজনের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না, কিন্তু কিশোর সাইকেলে চড়ল না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে জাহাজটার দিকে। নাক ঘুরে গেছে ওটার, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এদিকেই।

'কি হলো, চলো,' অধৈর্য হয়ে তাড়া দিল মুসা। 'সব কিছুতেই রহস্য খোঁজার স্বভাব ছাড়ো। রোজ শয়ে শয়ে লোক এদিক দিয়ে যায় আসে, তাছাড়া ইদানীং অনেকেই আমাদের মত শখের তিমি গবেষক হয়েছে। তিমির যাওয়া দেখার শখও আমাদের একলার না।'

'জানি,' সন্তুষ্ট হতে পারছে না কিশোর, হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলে নিয়ে চলল সাইকেল—বাধ্য হয়ে রবিন আর মুসাকেও ঠেলেই এগোতে হলো। 'কিন্তু বোটের লোকটা তিমি দেখছে না। ওর বিনকিউলারের চোখ তীরের দিকে, এদিকে। আমাদেরকেই দেখছে না তো?'

'দেখলে দেখছে। কোন অসুবিধে আছে তাতে?' বলল মুসা।

জবাব দিল না কিশোর।

মেরিচাচী অপেক্ষা করছেন। হাসিখুশি মানুষ, সারাক্ষণ হাসি লেগেই আছে মুখে। হাসেন না শুধু ছেলেদেরকে কাজ করানোর সময়, আর ইয়ার্ডের দুই কর্মচারী—দুই ব্যাভারিয়ান ভাই বোরিস আর রোভারকে খাটানোর সময়। ও, আরও একটা সময় হাসেন না, যখন রাশেদচাচা একগাদা পুরানো বাতিল জঞ্জাল মাল নিয়ে আসেন, যেগুলো কোনভাবেই বিক্রি করা যাবে না, তখন।

মাল জোগাড়েই ব্যস্ত থাকেন রাশেদ পাশা, ইয়ার্ডের দেখাশোনা মেরিচাচীকেই করতে হয়। কোনটা সহজেই নেবে খদ্দের, কোনটা নেবে না, স্বামীর চেয়ে অনেক ভাল বোঝেন তিনি।

তিন ছেলেকে দেখে হাঁ হাঁ করে উঠলেন মেরিচাচী, 'এই, তোরা কি রে? সেই কখন থেকে খাবার নিয়ে বসে আছি, সব জুড়িয়ে গেল,' সাইকেল থেকে কিশোরকে পাম্প নামাতে দেখে অবাক হলেন তিনি। 'আরে এই কিশোর, পাম্প নিয়েছিলি কেন?' রবিন আর মুসা নিয়ে যাওয়ার সময় দেখেননি তিনি, বোরিসের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওরা।

'সাগর সেঁচতে গিয়েছিলাম, চাচী,' হাসল কিশোর।

'তোর মাথা-টাতা খারাপ হয়ে যায়নি তো, এই কিশোর।'

মুসার এখন পেট জ্বলছে, মজা করার সময় নেই, তাড়াতাড়ি সব বুঝিয়ে বলল মেরিচাচীকে।

ভরপেট নাস্তা খেয়ে কাজে লেগে গেল তিন গোয়েন্দা। দুপুর পর্যন্ত গাধার মত খাটল। দুপুরের খাওয়া রেডি করে ডাকলেন মেরিচাচী। হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বসল ওরা।

খাওয়ার পর আবার রওনা হলো সাগর পারে, তিমিটাকে দেখতে।

# দুই

'হয়তো গড়িয়ে-টড়িয়ে নেমে চলে গেছে সাগরে,' বলল বটে মুসা, কিন্তু কথাটা সে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

'অসম্ভব,' রবিন বলল, 'যা শুকনো বালি···নাহ্, ইমপসিবল।'

কিশোর চুপ। গর্তের আশেপাশে ঘুরছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি দেখছে বালিতে।

'একটা ট্রাক এসেছিল,' সঙ্গীদের দিকে ফিরল কিশোর, 'ফোর হুইল ড্রাইভ। ওই ওদিকে কোথাও দিয়ে নেমেছিল, তারপর সৈকত ধরে এগিয়ে এসেছে। এই যে

এখানটায়, গর্তের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ, কয়েক ইঞ্চি দেবে গিয়েছিল চাকা, পরে সামনের চাকার নিচে বোর্ড ফেলে তুলতে হয়েছে।'

কোনটা কিসের দাগ বুঝিয়ে দিল কিশোর।

'ট্রাক!' বিড়বিড় করল মুসা।

'কেন, কোন সন্দেহ আছে?'

'তারমানে তুলে নিয়ে গেছে তিমিটাকে?'

'তাই করেছে,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'কিন্তু কারা? চরায় আটকা পড়ায় তিমি কারা নিতে পারে? কাদের দায়িত্ব?'

জবাবের অপেক্ষা করল সে। এগিয়ে গিয়ে গর্ত থেকে তারপুলিনটা ধরে টান দিল। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল রবিন আর মুসা।

'ওশন ওয়ারল্ড,' আধ ঘণ্টা পরে প্রশ্নের জবাব দিল কিশোর নিজেই। 'সকালে আমরা চলে আসার পর কেউ গিয়েছিল সৈকতে, তিমিটাকে দেখে ওশন ওয়ারল্ডে খবর পাঠিয়েছিল। ওরাই এসে তুলে নিয়ে গেছে।'

হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।

তিরিশ ফুট লম্বা একটা মোবাইল হোম ট্রেলারের ভেতরে গঠিত হয়েছে হেডকোয়ার্টার। অনেক আগে ওটা কিনে এনেছিলেন রাশেদ পাশা, বিক্রি হয়নি। নানা রকম লোহালক্কড়ের জঞ্জালের নিচে এখন পুরোপুরি চাপা পড়ে গেছে ট্রেলারটা। তার ভেতরে ঢোকার কয়েকটা গোপন পথ আছে, জানে শুধু তিন গোয়েন্দা। পথগুলো ওরাই বানিয়েছে।

অনেক যত্নে হেডকোয়ার্টার সাজিয়েছে ওরা। ভেতরে ছোটখাট একটা আধুনিক ল্যাবরেটরি বসিয়েছে, ফটোগ্রাফিক ডার্করুম করেছে, অফিস সাজিয়েছে— চেয়ার টেবিল ফাইলিং কেবিনেট সবই আছে। একটা টেলিফোনও আছে, বিল ওরাই দেয়। অবসর সময়ে ইয়ার্ডে কাজ করে, মুসা আর কিশোর, পারিশ্রমিক নেয়। স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে বই সাজানো-গোছানোর পার্ট টাইম চাকরি করে রবিন। তাছাড়া গোয়েন্দাগিরি করেও আজকাল বেশ ভাল আয় হচ্ছে।

টেলিফোন ডিরেক্টরিটা টেনে নিল কিশোর, ওশন ওয়ারল্ডের নাম্বার বের করে ডায়াল করল।

ফোনের সঙ্গে স্পীকারের যোগাযোগ করা আছে, ওপাশের কথা তিনজনে একই সঙ্গে শোনার জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা।

রিঙ হওয়ার শব্দ শোনা গেল, তারপর জবাব এল।

'ওশন ওয়ারল্ডে ফোন করার জন্যে ধন্যবাদ,' কেমন যেন যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, সাজানো কথা। 'টোপাঙ্গা ক্যানিয়নের উত্তরে, প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ের ঠিক পাশেই মিলবে ওশন ওয়ারল্ড।' গড়গড় করে আরও অনেক কথা বলে গেল লোকটাঃ টিকেটের দাম কত, দেখার কি কি জিনিস আছে, কোন দিন কটা থেকে কটা পর্যন্ত খোলা থাকে, ইত্যাদি। বলল, 'ওশন ওয়ারল্ড রোজই খোলা থাকে, সকাল দশটা থেকে বিকেল ছটা পর্যন্ত সোমবার ছাড়া…' রিসিভার নামিয়ে রাখল

কিশোর। এটাই জানতে চেয়েছিল।

'হায় হায়রে,' কপাল চাপড়াল মুসা, 'বদনসীব একেই বলে। হপ্তার যে দিনটায় বন্ধ সেদিনই ফোন করলাম আমরা।'

আনমনে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। ভাবছে কি যেন, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়েছে।

'তো এখন কি করব?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'আগামীকাল আবার ফোন করব?'

'ফোন করে আর কি হবে?' বলল কিশোর। 'যা জানার তো জেনেছিই। মাত্র কয়েক মাইল এখান থেকে। সাইকেলেই যাওয়া যাবে। কাল একবার নিজেরাই গিয়ে দেখে আসি না কেন?'

পরদিন সকাল দশটায় ওশন ওয়ারল্ডের বাইরে সাইকেল-স্ট্যাণ্ডে সাইকেল রেখে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াল বিশাল অ্যাকোয়ারিয়ামের আশেপাশে, কৃত্রিম ল্যাগুনে সী-লায়নের খেলা দেখল, তীরে পেঙ্গুইনের হুটোপুটি দেখল, তারপর চলল অফিস-বিল্ডিঙের দিকে। একটা দরজার ওপরে সাদা কালিতে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে ঃ অ্যাডমিনিসট্রেশন।

দরজায় টোকা দিল কিশোর।

মোলায়েম মেয়েলী গলায় সাড়া এল ভেতর থেকে, 'কাম ইন।'

অফিসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

ডেস্কের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক তরুণী। পরনে টু-পীস সুইম স্যুট—সাঁতার কাটতে যাচ্ছিল বোধহয়। গায়ের চামড়া রোদে পোড়া, গাঢ় বাদামী। ছোট করে ছাটা কালো চুল, কোমল, রেড ইণ্ডিয়ানদের মত। মুসার চেয়েও লম্বা, চওড়া কাঁধ, অস্বাভাবিক সরু কোমর, কেন যেন মাছের কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে হয়, ডাঙার চেয়ে পানিতেই তাকে মানাবে ভাল।

'আমি চিনহা শ্যাটানোগা,' বলল তরুণী। 'কিছু বলবে?'

'একটা তিমির খবর নিতে এসেছি,' বলল কিশোর। 'চরায় আটকা পড়েছিল···' খুলে বলল সে।

নীরবে সব শুনল টিনহা। কিশোরে কথা শেষ হলে বলল, 'কবের ঘটনা? গতকাল?'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর।

'গতকাল আমি ছিলাম না।' আলমারি খুলে একটা ডাইভিং মাস্ক বের করল টিনহা। 'সোমবারে দু-চারজন শুধু স্টাফ থাকে, আর সবার ছুটি।' মাস্কের ফিতে খুলে নিয়ে আবার ছেলেদের দিকে ফিরল সে, 'কিন্তু গতকাল কোন তিমি আনা হলে, আমি আজ আসার সঙ্গে সঙ্গে জানানো হত আমাকে।

'আনা হয়নি?' হতাশ শোনাল রবিনের কণ্ঠ।

মাথা নাড়ল টিনহা। মাস্কটা দেখতে দেখতে বলল, 'না, আনলে জানানো হতই। সরি, কিছু করতে পারলাম না তোমাদের জন্যে।'

'না না, দুঃখ পাওয়ার কি আছে···' তাড়াতাড়ি বলল মুসা।

'আমি দুঃখিত,' আবার বলল টিনহা। 'আমাকে এখন যেতে হচ্ছে। একটা শো আছে।'

'যদি তিমিটা সম্পর্কে কিছু জানতে পারেন,' তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিল কিশোর, 'আমাদের জানালে খুব খুশি হব।'

কার্ডটা নিয়ে টেবিলে রেখে দিল টিনহা, একবার চোখ বুলিয়েও দেখল না।

ঘুরে সারি দিয়ে দরজার দিকে এগোল ছেলেরা। দরজা খোলার জন্যে সবে হাত বাড়িয়েছে মুসা, পেছন থেকে ডেকে বলল টিনহা, 'তিমিটার জন্যে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে তোমাদের, না? সাধারণ একটা পাইলট কিংবা গ্রে…'

'হ্যাঁ, হচ্ছে,' বাধা দিয়ে বলল রবিন। 'কারণ ওটাকে বাঁচাতে অনেক কষ্ট করেছি…'

'চিন্তা কোরো না,' হাসল টিনহা। 'ভালই আছে ওটা। কেউ ওটাকে নিশ্চয় উদ্ধার করে নিয়ে গেছে,' বলেই আরেক দিকে তাকাল সে।

স্ট্যাণ্ড থেকে সাইকেল নিয়ে ঠেলে এগোল কিশোর, চড়ল না। নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে, বুঝতে পারল অন্য দুজন, তারাও ঠেলে নিয়ে এগোল।

ওশন ওয়ারল্ড থেকে একটা সরু পথ গিয়ে মিশেছে বড় রাস্তার সঙ্গে। সেখানে এসে সরু রাস্তার পাশের দেয়ালে সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখল কিশোর। দেখাদেখি অন্যেরাও তাই করল। কিশোরের হাসি হাসি মুখ, কোন জটিল রহস্যের সন্ধান পেলে যেমন হয়, তেমনি।

রবিন বিষণ্ণ, মুসা হতাশ। তিমিটার খোঁজ মেলেনি।

'এত হাসির কি হলো,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল মুসা।

'কোন কাজই তো হলো না।'

'কে বলল?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'কে বলল মানে? তিমির খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'পুরোপুরি নয়, তবে নিরাপদে আছে বোঝা গেছে,' বলল কিশোর। 'বিশদ পর্যালোচনা করে দেখা যাক। ওশন ওয়ারল্ডের কথাই ধরো, সোমবারে বন্ধ থাকে। সেদিন কেউ ওখানে ফোন করলে জ্যান্ত মানুষের সাড়া পাবে না, শুনতে পাবে কতগুলো টেপ করা কথা। ও হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস, কাল ফোনে যে কথাগুলো আমরা শুনেছি, সব টেপ করা কথা। সোমবারের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা। কেউ রিঙ করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশিন চালু হয়ে যায়, গড় গড় করে শ্রোতাকে শুনিয়ে দেয় একগাদা তথ্য। এর মানে কি? কোন মানুষ যদি ফোন না ধরে…'

'তাহলে তিমিটার কথা জানানো যাবে না,' কিশোরের কথা শেষ করে দিল মুসা।

'না। তবে টিনহা শ্যাটানোগাকে বাড়িতে ফোন করতে কোন বাধা নেই, যদি তার নম্বর জানা থাকে। এবং সেটাই কেউ করেছিল।'

'কে বলল তোমাকে?' রবিনের প্রশ্ন।

'কেউ বলেনি, অনুমান করে নিয়েছি, টিনহার কথা থেকেই। তিমিটার চরায় আটকা পড়ার কথা শুনে অবাক হয়নি, গায়েব হওয়ার কথা শুনে হয়নি। আমি বলে

গেছি, সে শুনেছে, যেন শোনা কথাই আরেকবার শুনছে। তাছাড়া সে জানল কি করে, গতকালের ঘটনা এটা? আমি তো একবারও বলিনি।'

'ওটা তো প্রশ্ন করেছে,' তর্ক করল মুসা।

'ওই প্রশ্নটাই জবাব। কবের ঘটনা, এটুকু বললেই তো পারত। আবার উল্লেখ করার কি দরকার ছিল। আসলে কথাটা ঘুরছিল তার মনে, ফলে বলে ফেলেছে। তারপর আরও একটা ব্যাপার, প্রথমে স্বীকারই করতে চায়নি তিমিটার কথা, গতকাল অফিসে আসেনি বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। শেষে রবিনের উৎকণ্ঠা দেখে বলেই ফেলেছে নিরাপদ আছে। কিছুই যদি না জানে নিরাপদে আছে, জানল কি করে?'

'ঠিকই বলেছ,' মাথা দোলাল রবিন। 'আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? বলল পাইলট কিংবা গ্রে হোয়েল। শুধু ওই দু-জাতের নাম কেন? আরও তো অনেক জাতের তিমি আছে। তাছাড়া পাইলটের নামই বা প্রথমে কেন...'

'তুমি জানো ওটা পাইলট?' ভুরু কোঁচকাল মুসা।

'জানি,' বলল রবিন। 'গতকালই বুঝতে পেরেছি। বলার সুযোগ পাইনি, তারপর আর মনে ছিল না।'

'অ।...পাইলট আর গ্রে-র তফাতটা কি?'

'গ্রে-র ফোয়ারার ছিদ্র থাকে দুটো, নাকের ফুটোর মত পাশাপাশি। পাইলটের থাকে একটা। আকারেও পাইলটের চেয়ে অনেক বড় হয় গ্রে। কাল যেটাকে বাঁচিয়েছি আমরা, ওটা শিশু নয়, যুবক। পাইলট বলেই এত ছোট।' রবিনের জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল মুসা, তার আগেই কিশোর বলল, 'হুঁ, তা যা বলছিলাম। তিমিটার কথা ভালমতই জানে টিনহা। কিন্তু বুঝতে পারছি না, ওশন ওয়ারল্ডের একজন ট্রেনার সাধারণ একটা তিমি হাইজ্যাক করতে যাবে কেন? কেন মিছে...'

গাড়ির হর্নের তীক্ষ্ণ শব্দে বাধা পড়ল কথায়।

ওশন ওয়ারল্ড থেকে বেরিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে এল একটা সাদা পিকআপ, বড় রাস্তায় উঠে মোড় নিয়ে চলে গেল দ্রুত। চালাচ্ছে টিনহা শ্যাটানোগো।

'হুঁ, খুব দ্রুত ঘটতে শুরু করেছে ঘটনা,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'মানে?' বুঝতে পারছে না মুসা।

'কয় মিনিট আগে কি বলেছিল আমাদেরকে?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'একটা জরুরী শো দেখাতে যাচ্ছে। শো হলে তো অ্যাকোয়ারিয়ামের ভেতরে হবে, বাইরে কি? আর এত তাড়াহুড়ো কেন?'

'শো দেখাতেই তৈরি হচ্ছিল,' মুসার কথায় বিশেষ কান দিল না কিশোর, 'কিন্তু বাধ সেধেছি আমরা। হয়তো কোন ভাবে চমকে দিয়েছি। তাই শো ফেলে রেখে আরও জরুরী কোন কাজ করতে চলে গেছে।'

# তিন

'না হয় ধরলামই মিছে কথা বলেছে টিনহা,' বলল মুসা, 'কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়?'

শেষ বিকেল। সকালে ওশন ওয়ারল্ড থেকে রকি বীচে ফিরেই লাইব্রেরিতে কাজে চলে যায় রবিন। মুসা যায় বাড়ির লন পরিষ্কার করতে, মাকে কথা দিয়েছিল আজ সাফ করে দেবে। ইয়ার্ডে বোরিস আর রোভারকে সাহায্য করেছে কিশোর। কাজ সারতে সারতে বিকেল হয়ে গেছে তিনজনেরই। হেডকোয়ার্টারে জমায়েত হয়েছে এখন। এর আগে আর আলোচনার সুযোগ হয়নি।

'তাছাড়া মিথ্যে কথা বলা বড়দের স্বভাব,' বলেই গেল মুসা, 'কোন কারণ ছাড়াই মিছে কথা বলবে। গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করো, দশটা প্রশ্ন করে আগে তোমার মেজাজ বিগড়ে দেবে। তারপর যে জবাবটা দেবে সেটা হয় ঘোরানো-প্যাঁচানো, নয় স্রেফ মিছে কথা···'

কথা শেষ করতে পারল না মুসা, টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল কিশোর।

'হালো,' স্পীকারে শোনা গেল পুরুষের গলা। 'কিশোর পাশার সঙ্গে কথা বলতে চাই, প্লীজ।'

'বলছি।'

'আজ সকালে ওশন ওয়ারল্ডে একটা হারানো তিমির খোঁজ নিতে গিয়েছিলে,' কথায় কেমন একটা অদ্ভুত টান, তাছাড়া কিছু কিছু শব্দ ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করে, যেমন ওয়ারল্ডকে বলছে 'ওয়া-রলড'।

হয়ত মিসিসিপির ওদিকের কোনখানের লোক, ভাবল রবিন, অ্যালবামার হতে পারে। ওই অঞ্চলের কারও সঙ্গে আগে কখনও পরিচয় হয়নি তার, তবে টেলিভিশনে দেখেছে, দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা ওরকম করেই টেনে টেনে কথা বলে, তবে এই লোকটা আরও এক কাটি বাড়া, শব্দও ভেঙে ফেলেছে।

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম,' জবাব দিল কিশোর। 'কেন?'

'আমি আরও জেনেছি তোমরা একধরনের শখের গোয়ে-নদা···'

'হ্যাঁ, আমরা গোয়ে-ন্দাই। নানা রকম সমস্যা···'

কিশোরকে বলতে দিল না লোকটা। 'তাহলে নিশ্চয় একটা কেস নিতে আগ্রহী হবে,' আগ্রহীকে বলল আগ-রহী, 'তিমিটাকে খুঁজে বের করে সাগরে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারলে একশো ডলার পুরস্কার দেব।'

'একশো ডলার!' ফিসফিস করে বলল রবিন, 'ব্যাটার কি লাভ?'

কিশোর জবাব না দেয়ায় আবার বলল লোকটা, 'তাহলে কেসটা নিচ্ছ? কেসটা উচ্চারণ করল 'কেস-আস'।

'খুশি হয়ে নেব,' হাত বাড়িয়ে একটা প্যাড আর পেনসিল টেনে নিল কিশোর। 'আপনার নাম আর ফোন নম্বর···'

'ফাইন,' বাধা দিয়ে বলল লোকটা। 'তাহলে এখুনি কাজে নেমে পড়ো। দিন দুয়েকের মধ্যেই আবার খোঁজ নেব।'

'কিন্তু আপনার নাম···' থেমে গেল কিশোর, লাইন কেটে দিয়েছে ওপাশ থেকে। এক মুহূর্ত হাতের রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে রইল সে, তারপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল। 'কাজ দিল, পুরস্কার ঘোষণা করল,' আনমনে বলল কিশোর, 'কিন্তু নিজের নাম বলল না। আজ সকালে ওশন ওয়ারল্ডে গিয়েছি সেকথাও জানে···' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল সে।

'কিশোর,' মুসা বলল, 'কেসটা নিচ্ছ তো? একশো ডলার, কম কি?'

'মোটেই কম নয়। টাকার চেয়েও বড় এখন এই রহস্যময় কল, এর রহস্য ভেদ করতেই হবে। তার ওপর যোগ হয়েছে একটা হারানো তিমি। কিন্তু কথা হচ্ছে, তদন্ত শুরু করি কোনখান থেকে?' কয়েক সেকেণ্ড নীরব রইল কিশোর, তারপর টেনে নিল টেলিফোন বুক। 'টিনহা শ্যাটানোগা। এই একটাই সূত্র আছে আমাদের হাতে।'

দ্রুত ডিরেক্টরির পাতা উল্টে চলল কিশোর। প্রথমে নামটা বিদঘুটে মনে হয়েছে তার কাছে, কিন্তু একেবারে যে দুর্লভ নাম নয়, ফোন বুক ঘেঁটেই সেটা বোঝা গেল। এক শহরেই শ্যাটানোগা পাওয়া গেল আরও তিনজন। জিমবা শ্যাটানোগা, শিঁয়াওঁ শ্যাটানোগা আর ম্যারিবু শ্যাটানোগা। কিন্তু টিনহা শ্যাটানোগার নাম নেই।

মিস্টার জিমবাকে দিয়েই শুরু করল কিশোর। তিনটে রিঙের পর জবাব দিল অপারেটর, জিমবা শ্যাটানোগার লাইন কেটে দিয়েছে টেলিফোন বিভাগ।

অনেকক্ষণ ধরে শিঁয়াওঁ শ্যাটানোগার ফোন কেউ ধরল না, তারপর মোলায়েম একটা গলা প্রায় ফিসফিসিয়ে জবাব দিল। জানাল ব্রাদার শিঁয়াওঁ মন্দিরে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। যদি তিনি এসে ফোন ধরেনও কিশোরের কথা শুধু শুনতেই পারবেন, জবাব দিতে পারবেন না, কারণ ছ-মাস ধরে কথা বন্ধ রেখেছেন তিনি, আরও অনেকদিন রাখবেন। শুধু ইশারায়ই নিজের প্রয়োজনের কথা জানান।

'হেত্তোরি!' লাইন কেটে দিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আগে ভাবতাম পাগলের গোষ্ঠী খালি ভারত আর আমার দেশেই আছে, এখন দেখছি এখানে আরও বেশি। কথা বন্ধ রেখেছে না ছাই, হুঁহ্,' বলতে বলতেই তৃতীয় নম্বরটায় ডায়াল করল।

আগের দুজনের তো কোনভাবে জবাব পাওয়া গেছে, এটার কোন সাড়াই এল না। কেউ ধরল না ফোন।

ম্যারিবু শ্যাটানোগার নামের নিচে লেখা রয়েছে ঃ চার্টার বোট ফিশিং। আরেকবার চেষ্টা করে দেখল কিশোর, কিন্তু এবারও সাড়া মিলল না।

'চার্টার-বোট-ফিশিং-শ্যাটানোগার খবরই নেই,' রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। 'হলো না। অন্য কোন উপায় বের করতে হবে।'

'টিনহাকে কোথায় পাওয়া যাবে, জানি আমরা,' বলল রবিন। 'হপ্তায় ছ-দিন পাওয়া যাবে তাকে ওশন ওয়ারল্ডে।'

'আরও একটা ব্যাপার জানি,' কিশোর যোগ করল, 'মানে চিনি। তার পিকআপ

ট্রাক।' চোখ আধবোজা করল সে, ভাবনা আর কথা একই সঙ্গে চলছে। 'বিকেল ছ-টায় বন্ধ হয় ওশন ওয়ারল্ড। তারপরেও নিশ্চয় অনেকক্ষণ থাকতে হয় টিনহাকে, কারণ সে ট্রেনার। দর্শক চলে যাওয়ার পরও তার কাজ থাকে।' ঝট করে সোজা হলো সে: 'মুসা তোমাকে একটা দায়িত্ব দিতে চাই। আজ হবে না, দেরি হয়ে গেছে। কাল যাবে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'কোথায়?'

'কাল বলব।'

পরদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বোরিসকে পাকড়াও করল কিশোর, তাদেরকে ওশন ওয়ারল্ডে নামিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

ইয়ার্ডের ছোট ট্রাকটা বের করল বোরিস, তাতে দুটো সাইকেল তোলা হলো। তিন কিশোরের কাজেকর্মে আজকাল আর বিশেষ অবাক হয় না সে, তবু প্রশ্ন না করে পারল না, 'তোমরা মানুষ তিনজন, সাইকেল নিয়েছ দুটো। তৃতীয়জনকে কি দুই সাইকেলে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরবে?'

'মুসার সাইকেলের দরকার হবে না,' বোরিসকে আশ্বস্ত করল কিশোর। 'বিনে পয়সায় গাড়িতে চড়বে সে।'

'হোকে (ও-কে),' শ্রাগ করল বোরিস। আর কিছু না বলে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল।

ওশন ওয়ারল্ডের পার্কিং লটে গাড়ি থামাল বোরিস। সাইকেল নিয়ে নেমে পড়ল তিন কিশোর।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল বোরিস, 'আমাকে দরকার হলে ফোন কোরো ইয়ার্ডে।' ট্রাক ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল সে।

টিনহার গাড়িটা খুঁজতে শুরু করল ওরা। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না, দড়ির বেড়া দেয়া, 'স্টাফ' লেখা সাইনবোর্ড লাগানো একটা জায়গায় দেখা গেল সাদা পিকআপটা। ঘুরে গাড়ির পেছনে চলে গেল কিশোর আর মুসা, গেটে পাহারায় রইল রবিন। টিনহাকে আসতে দেখলে বন্ধুদের হুঁশিয়ার করে দেবে।

ট্রাকের পেছনটা খালি নয়। নানারকম জিনিসপত্র—ফোম রবারের লম্বা লম্বা ফালি, এলোমেলো দড়ি, আর বেশ বড়সড় এক টুকরো ক্যানভাস, ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মেঝেতে শুয়ে পড়ল মুসা। ক্যানভাস দিয়ে তাকে ঢেকে দিল কিশোর। রবারের ফালিগুলো এমনভাবে চারপাশে আর ওপরে রেখে দিল, যাতে বোঝা না যায় কিছু। তাছাড়া আরেকটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে, গাড়ির পেছনে কেউ খুঁজে দেখতে আসবে বলেও মনে হয় না।

'আমরা কেটে পড়ি,' মুসাকে বলল কিশোর। 'ঘোরাঘুরি করতে দেখলে সন্দেহ করে বসবে টিনহা। হেডকোয়ার্টারে অপেক্ষা করব তোমার জন্যে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' ক্যানভাসের তলা থেকে জবাব দিল মুসা। 'যত শীঘ্রি পারি ফোন করব।'

কিশোরের নেমে যাওয়ার আওয়াজ শুনল মুসা। তারপর অনেকক্ষণ আর কোন

শব্দ নেই, শুধু পার্কিং লটে মাঝে মাঝে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়া ছাড়া।

বেশ আরামেই আছে মুসা, সারাটা দিন পরিশ্রমও কম করেনি। ঘুম এসে গেল তার। হঠাৎ একটা শব্দে তন্দ্রা টুটে গেল। ক্যানভাসের ওপর পানি ছিটকে পড়েছে, কয়েকটা ফোঁটা চুঁইয়ে এসে তার মুখ ভিজিয়ে দিল। ঠোঁটেও লাগল পানি। কি ভেবে জিভ দিয়ে চাটল। নোনা পানি।

ট্রাকটা স্টার্ট নিল। গতি বাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল মুসা, তারপর সাবধানে মুখের ওপর থেকে ক্যানভাস সরিয়ে উঁকি দিল। তার মুখের কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়েছে বড় একটা প্ল্যাসটিক কনটেইনার। চার পায়ের ওপর রয়েছে জিনিসটা। মুসা রয়েছে তলায়। পানি ছলাৎ-ছল করছে ভেতরে। জীবন্ত কিছু ঘষা মারছে কনটেইনারের গায়ে।

মাছ, অনুমান করল মুসা, মাছ জিয়ানো রয়েছে ভেতরে। আবার মুখের ওপরে ক্যানভাস টেনে দিল সে।

ছুটে চলেছে ট্রাক, ঝাঁকুনি প্রায় নেই। তারমানে সমতল মসৃণ রাস্তা দিয়ে চলেছে। বোধহয় কোস্ট হাইওয়ে ধরেই। কয়েক মিনিট পর গতি কমল ট্রাকের। ওপর দিকে উঠতে শুরু করল পাহাড়ী পথ বেয়ে। কোথায় এল? সান্তা মনিকা? কোন দিকে কবার মোড় নিচ্ছে গাড়ি খেয়াল রাখার চেষ্টা করল সে। কিন্তু বেশিক্ষণ পারল না। গোলমাল হয়ে গেল। আবার সমতলে নেমে এল গাড়ি।

অন্ধকার নামার পর আবার ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল গাড়ি। বেশ ঘোরানো পথ। সান্তা মনিকার পাহাড়ী অঞ্চলেরই কোন জায়গা হবে, অনুমান করল মুসা।

অবশেষে থামল পিকআপ। টেইল গেট নামানোর শব্দ শোনা গেল। তারপর খালি পায়ের শব্দ। দম বন্ধ করে রইল মুসা।

পানির জোর ছলাৎ-ছল, নিশ্চয় কনটেইনারটা তোলা হচ্ছে। চলে গেল পায়ের শব্দ।

মিনিট তিনেক অপেক্ষা করল মুসা, তারপর ওপর থেকে ক্যানভাস সরাল।

বেশ বড়সড় বিলাসবহুল একটা র‍্যাঞ্চ হাউসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পিকআপ। সদর দরজার সামনে একটা ল্যাম্প জ্বলছে। কংক্রিটের সিঁড়ি উঠে গেছে দরজা পর্যন্ত। সিঁড়ির গোড়ায় একটা মেইলবক্স। নামটা পড়তে পারছে মুসা ঃ উলফ।

আরও এক মিনিট অপেক্ষা করল মুসা, তারপর খুব সাবধানে নামল ট্রাক থেকে। ঘুরে চলে এল গাড়ির সামনের দিকে, বনেটের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাড়িটার ওপর নজর রাখার ইচ্ছে।

কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এই এলাকায় ওরকম বাড়ি থাকতে পারে ভাবেনি সে। তবে অবাক হলো অন্য একটা কারণে। দরজার কাছে ওই একটি মাত্র আলো ছাড়া পুরো বাড়িটা অন্ধকার। কোন জানালায় আলো নেই। টিনহা ওই বাড়ির ভেতরে গিয়েছে কিংবা আছে বলে মনে হয় না ভাবসাব দেখে।

এখানে সারারাত এভাবে ঘাপটি মেরে থাকার কোন মানে নেই, ভাবল মুসা।

দুটো কাজ করতে পারে সে এখন। গলির মাথায় গিয়ে রাস্তার নাম-নম্বর জেনে উলফের ঠিকানা জানিয়ে কোথাও থেকে ফোন করতে পারে কিশোরের কাছে। কিংবা খোঁজ করে দেখতে পারে, টিনহা কোথায় গেছে, কি অবস্থায় আছে, কি করছে প্ল্যাসটিক কনটেইনারের জ্যান্ত মাছ নিয়ে।

দুটোর মধ্যে প্রথমটাই মনঃপূত হলো মুসার। গলির মাথায় যাওয়ার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছে, এই সময় মেয়েলী কণ্ঠে কথা শোনা গেল, কাকে জানি নাম ধরে ডাকছেঃ 'রোভার! রোভার!'

ডাকের জবাব শোনা গেল না।

মুসা শিওর, ঘরের ভেতর থেকে কথা বলেনি মেয়েটা, বাইরে কোথাও রয়েছে। হয়তো পেছনের আঙিনায়।

বাড়িতে ঢোকার পথ খুঁজতে লাগল মুসা। চোখে পড়ল, বাঁ দিকে কংক্রিটের একটা সরু পথ ধীরে ধীরে উঠে গেছে গ্যারেজে। গ্যারেজের পাশে একটা কাঠের ছোট গেট, তার ওপরে তারাজ্বলা কালো আকাশের পটভূমিকায় কয়েকটা পাম গাছের মাথা।

নিঃশব্দে গেটের কাছে চলে এল মুসা। সাধারণ একটা খিল দিয়ে গেটের পাল্লা আটকানো রয়েছে। ভেতরে ঢুকে আবার লাগিয়ে দিল পাল্লা।

গ্যারেজের পেছনে সিমেন্ট বাঁধানো একটা পাকা পথ। এদিক ওদিক তাকিয়ে ঝুঁকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল পা পা করে।

আবার ডাক শোনা গেল ঃ 'রোভার! রোভার!'

খুব কাছেই রয়েছে মহিলা। মুসার মনে হলো, মাত্র কয়েক গজ দূরে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। সামনে আর বাঁয়ে এক চিলতে করে ঘাসে ঢাকা জমির কিনারে দাঁড়িয়ে আছে পামের সারি, রাস্তা থেকেই দেখেছে ওগুলো। ডানের কিছু দেখতে পারছে না। বাগান বা যা-ই থাকুক ওখানে দেখা যাচ্ছে না এখনও গ্যারেজের দেয়ালের জন্যে। এক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে চিন্তা করল সে, তারপর এক ছুটে ঘাসে ঢাকা জমি পেরিয়ে চলে এল পামের সারির কাছে। লম্বা দম নিয়ে ঘুরে তাকাল।

চোখে পড়ল বিশাল এক সুইমিং পুল, মূল বাড়িটার প্রায় সমান লম্বা। পানির নিচে আলো, ঝিকমিক করছে টলটলে পানি।

'রোভার। লক্ষ্মী ছেলে রোভার,' বলল টিনহা।

সুইমিং পুলের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে সে, পরনে সেই টু-পীস সাঁতারের পোশাক, অফিসে যেটা পরে ছিল সকালে। তার পাশে কংক্রিটের চত্বরের ওপর রাখা আছে প্ল্যাসটিকের কনটেইনারটা।

ঝুঁকে কনটেইনার থেকে একটা মাছ তুলে নিল টিনহা, জ্যান্ত মাছ, ছটফট করছে, লেজ ধরে ওটাকে ছুঁড়ে মারল। বৈদ্যুতিক আলোয় ক্ষণিকের জন্যে রূপালী একটা ধনুক সৃষ্টি করে পুলের ওপর উড়ে গেল মাছটা।

সঙ্গে সঙ্গে পানি থেকে মাথা তুলল একটা ধূসর জীব। উঠছে, উঠছে, উঠছে, পানি থেকে বেরিয়ে এল পুরো সাত ফুট শরীর। একটা মুহূর্ত শূন্যেই স্থির হয়ে ঝুলে

রইল যেন। মুখ হাঁ করে রেখেছে। শূন্যে থেকেই মোচড় দিয়ে শরীর বাঁকিয়ে ধরে ফেলল উড়ন্ত মাছটা, তারপর নিখুঁত ভাবে ডিগবাজি খেয়ে আবার পানিতে পড়ল মাছ মুখে নিয়ে।

'রোভার লক্ষ্মী ছেলে,' হাসি মুখে প্রশংসা করল টিনহা। ডুবুরীর ফ্লিপার পরাই আছে তার পায়ে, ডাইভিং গগলসটা ফিতেয় ঝুলছে গলা থেকে, ওটা পরে নিল চোখে। পুলে নামল।

বেশ ভাল সাঁতারু মুসা নিজে, অনেক ভাল ভাল সাঁতারুকে দেখেছে, কিন্তু টিনহার মত কাউকে আর দেখেনি। সাঁতার কাটার জন্যেই যেন জন্ম হয়েছে তার, ডাঙা নয়, পানির জীব যেন সে, এমনি স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতার কাটছে। হাত-পা প্রায় নড়ছেই না, বাতাসে ডানা মেলে যে ভাবে ভেসে উড়ে চলে সোয়ালো পাখি টিনহার সাঁতার কাটার ভঙ্গি অনেকটা সেরকম।

চোখের পলকে চলে এল পুলের মাঝখানে ছোট তিমিটার কাছে। এমন ভাবভঙ্গি যেন অনেক পুরানো বন্ধুত্ব। নাক দিয়ে আস্তে করে টিনহার গায়ে গুঁতো মারল তিমিটা। ওর গোল মাথাটা ডলে দিল টিনহা, ঠোঁটে টোকা দিয়ে আদর করল। এক সঙ্গে ডাইভ দিয়ে নেমে চলে গেল পুলের তলায়, হুঁশ করে ভেসে উঠল আবার। পাশাপাশি সাঁতার কাটল কিছুক্ষণ, তারপর তিমির পিঠে সওয়ার হলো টিনহা।

কোথায় রয়েছে ভুলেই গেছে মুসা দেখতে দেখতে। নিজের অজান্তেই একটা গাছের গোড়ায় ঘাসের ওপর বসে পড়েছে, থুতনিতে হাত ঠেকানো। এরকম দৃশ্য সিনেমায়ও দেখা যায় না, পুরোপুরি মগ্ন হয়ে গেছে সে।

নতুন খেলা শুরু করল টিনহা। তিমিটাকে নিয়ে চলে এল পুলের এক প্রান্তে, মুসা যেদিকে বসে আছে সেদিকে। তিমির মাথায় আস্তে করে চাপড় দিয়ে হঠাৎ পানিতে ডিগবাজি খেয়ে শরীর ঘুরিয়ে শাঁ করে চলে গেল দূরে। তিমিটা অনুসরণ করল তাকে।

আবার তিমির মাথায় চাপড় দিল টিনহা, মাথা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। আবার সরে গেল তিমির কাছ থেকে। এবার আর পিছু নিল না তিমি, যেখানে আছে সেখানেই রইল।

পুলের অন্য প্রান্তে গিয়ে কংক্রিটে বাঁধানো পাড়ের কিনারে উঠে পানিতে পা ঝুলিয়ে বসল টিনহা। অপেক্ষা করে আছে তিমি।

'রোভার! রোভার!' ডাকল টিনহা।

পানি থেকে মাথা তুলল তিমি। চোখ সতর্ক হয়ে উঠেছে, দেখতে পাচ্ছে মুসা। ছুটতে শুরু করল তিমি। পানির মধ্যে দিয়ে শাঁ করে উড়ে গিয়ে পৌঁছল যেন টিনহার পায়ের কাছে।

'লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী রোভার,' তিমির ঠোঁট ছুঁয়ে আদর করল টিনহা। কাত হয়ে হাত বাড়িয়ে কনটেইনার থেকে একটা মাছ এনে গুঁজে দিল রোভারের খোলা মুখে।

'লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী রোভার,' আবার তিমিটাকে আদর করল সে। তারপর পাশে ফেলে রাখা একটা কি যেন তুলে নিল।

জিনিসটা কি চিনতে পারছে না মুসা। পুলের নিচে আলো আছে, তাতে পুরোপুরি আলোকিত হয়েছে পানি। কিন্তু পুলের ওপরে চারধারে অন্ধকার।

নাম ধরে ডাকল তিমিটাকে টিনহা।

মাথা তুলেই রেখেছে রোভার, আস্তে আস্তে উঁচু করতে শুরু করল শরীর। লেজের ওপর খাড়া হয়ে উঠল আশ্চর্য কায়দায় পানিতে ভর রেখে। ওটাকে জড়িয়ে ধরল টিনহা। না না, জড়িয়ে তো ধরেনি, দুহাত তিমির মাথার পেছনে নিয়ে গিয়ে কি যেন করছে।

ভাল করে দেখার জন্যে মাথা আরেকটু উঁচু করল মুসা। চিনে ফেলল জিনিসটা। ক্যানভাসের তৈরি একটা লাগাম পরাচ্ছে টিনহা। ঘাড় তো নেই তিমির চোখের পেছনে যেখানে ঘাড় থাকার কথা সেখানে লাগিয়ে দিচ্ছে বেল্ট। শক্ত করে বাকলেস আটকে দিল। ঠিক লাগাম বলা যায় না ওটাকে, কুকুরের গলায় যে রকম কলার আটকানো হয় তেমন ধরনের একটা কিছু, কলারও ঠিক বলা চলে না।

হঠাৎ মাথা নুইয়ে ফেলল মুসা। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

গেট খোলার শব্দ। বন্ধ হওয়ার শব্দও শোনা গেল। এগিয়ে আসছে পায়ের আওয়াজ। এত কাছে এসে গেল, মুসার ভয় হলো তাকে না দেখে ফেলে।

পুলের দিকে চলে গেল পদশব্দ, থামল।

'হাই টিনহা,' পুরুষের গলা।

'গুড ইভিনিং, মিস্টার উলফ।'

মাথা তুলে দেখার সাহস হলো না মুসার, শুধু থুতনিটা ঘাসের ছোঁয়া মুক্ত করে তাকাল পুলের দিকে।

টিনহার পাশে দাঁড়িয়েছে লোকটা। বেঁটেই বলা চলে, মেয়েটার চেয়ে ইঞ্চি ছয়েক খাটো। অন্ধকারে রয়েছে মুখ। চেহারা বোঝার উপায় নেই। তবে একটা জিনিস দিনের আলোর মত স্পষ্ট। টাক। পুরো মাথা জুড়ে টাক, আবছা অন্ধকারেও চকচক করছে। হাতের চামড়া আর শরীরের বাঁধন দেখে অনুমান করল মুসা, লোকটার বয়েস তিরিশের বেশি হবে না, বয়েসের ভারে চুল উঠে গেছে তা নয়।

'কেমন চলছে?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'কখন রেডি হবে?' টেনে টেনে কথা বলে।

'শুনুন, মিস্টার উলফ,' লোকটার দিকে তাকাল টিনহা, শীতল কণ্ঠস্বর। রেগে যাচ্ছে বোঝাই যায়। 'শুধু বাবার জন্যে আপনাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছি। আমাকে আমার মত কাজ করতে দিন। সময় হলে বলব। বেশি বাড়াবাড়ি যদি করেন, রোভার সাগরে ফিরে যাবে। আরেকটা তিমি এবং আরেকজন ট্রেনার খুঁজে বের করতে হবে তখন আপনাকে।' এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'বুঝেছেন?'

'বুঝেছি, মিস শ্যাটআ-নোগা।'

# চার

'ঠিক শুনেছ তুমি?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'শিওর, ওই একই গলা?'

র‍্যাঞ্চ বাড়িটা থেকে বেরিয়ে ডবল মার্চ করে পাহাড়ী পথ ধরে একটা পেট্রল স্টেশনে নেমে আসতে বিশ মিনিট লেগেছে মুসার, হেডকোয়ার্টারে ফোন করেছে। আরও বিশ মিনিটের মাথায় বোরিস আর রবিনকে নিয়ে গাড়িসহ পৌঁছেছে কিশোর, তিনজনেই ফিরে যাচ্ছে এখন রকি বীচে।

যা যা ঘটেছে সব বলেছে মুসা। মাথার নিচে হাত রেখে ট্রাকের মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে সে।

'শিওর মানে?' ঘুমজড়ানো গলায় বলল মুসা, 'একশোবার শিওর। মিস-টার উলফই তখন ফোন করেছিল। ওই একই কণ্ঠ টেনে টেনে কথা বলে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়েছে। মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছে না। কেন একজন তার নিজের পুলেই একটা তিমি লুকিয়ে রেখে ওটাকে খুঁজে বের করার অনুরোধ জানাবে, আবার তার জন্যে একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করবে?

অনেক ভেবেও কিছু বুঝতে পারল না কিশোর। এখন আর পারবে না, বুঝতে পারল। প্রশ্নটা মনে নিয়ে ঘুমাতে হবে। হয়তো ঘুম ভাঙার পর পেয়ে যাবে জবাব।

প্রথমে মুসার বাড়িতে তাকে নামিয়ে দেয়া হলো। তারপর রবিনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ইয়ার্ডে ফিরে এল বোরিস আর কিশোর। কথা হয়েছে, আগামী সকালে যত তাড়াতাড়ি পারে এসে হেডকোয়ার্টারে মিলিত হবে তিন গোয়েন্দা।

পরদিন রবিন এল সবার পরে। মা আটকে দিয়েছিলেন। সবে বেরোতে যাচ্ছে রবিন, ডেকে বললেন, নাস্তার পরে অনেক কাপ-ডিশ জমে আছে, ওগুলো ধুয়ে দিয়ে গেলে তাঁর উপকার হয়।

ইয়ার্ডের এক কোণে তিন গোয়েন্দার ওয়ার্কশপের বাইরে সাইকেল রাখল রবিন। একটা ওয়ার্কবেঞ্চের ওপাশে জঞ্জালের গায়ে কাত হয়ে যেন অবহেলায় পড়ে রয়েছে একটা লোহার পাত, ইচ্ছে করেই রাখা হয়েছে ওভাবে। সরাল ওটা রবিন। বেরিয়ে পড়ল মোটা একটা লোহার পাইপের মুখ। এর নাম রেখেছে ওরা দুই সুড়ঙ্গ। জঞ্জালের তলা দিয়ে গিয়ে পাইপের অন্য মুখটা যুক্ত হয়েছে মোবাইল হোমের মেঝের একটা গর্তের সঙ্গে।

পাইপের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এসে, ট্রেলারের মেঝের গর্তের মুখে লাগানো পাল্লা তুলে অফিসে ঢুকল রবিন। অন্য দুজন অপেক্ষা করছে।

ডেস্কের ওপাশে তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসেছে কিশোর। পুরানো একটা রকিং চেয়ারে গা ঢেলে দিয়েছে মুসা, পা রেখেছে ফাইলিং কেবিনেটের একটা আধখোলা ড্রয়ারের ওপর। কেউ কিছু বলল না।

এগিয়ে গিয়ে একটা টুলে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল রবিন।

সব সময়ই যা হয়, আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। আলোচনার শুরুতে মুখ খুলল প্রথমে কিশোর, 'বড় রকম কোন সমস্যায় যদি পড়োও, ভাবতে ভাবতে তোমার মন গিয়ে ধাক্কা খায় কোন দেয়ালে, সামনে পথ রুদ্ধ থাকে,' রবিনের দিকে তাকাল সে, 'দুটো উপায় খোলা থাকে তোমার জন্যে। হয় দেয়ালে মাথা কুটে মরা, কিংবা ওটা ঘুরে গিয়ে অন্য কোনখান দিয়ে কোন পথ বের করে নেয়া।'

'ব্যস, বোঝো এখন, মরোগে দেয়ালে মাথা কুটে!' রাবনের দিকে চেয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'কিশোর, তোমার দোহাই লাগে, ল্যাটিন ছেড়ে ইংরেজি বলো। চাইলে বাংলাও বলতে পারো, তা-ও এত কঠিন লাগবে না।'

'ম্যারিবু শ্যাটানোগার কথা বলছি,' কঠিন কথার সহজ ব্যাখ্যা করল কিশোর। 'ম্যারিবু শ্যাটানোগা, চার্টার বোট ফিশিং।'

হতাশ ভঙ্গিতে দুই হাত তুলল মুসা। কিছু বুঝল না।

'ডাকো তাকে,' কিশোরকে বলল রবিন। 'আমার মনে হয় না, সে এতে জড়িত। তবে জিজ্ঞেস করতে দোষ কি?'

'নাস্তার পর থেকে কয়েকবার চেষ্টা করেছি,' বলল কিশোর। 'সাড়া নেই।'

'হয়ত মাছ ধরতে গেছে, জেলে তো,' মন্তব্য করল মুসা। 'বাড়িতে না থাকলে ফোন ধরবে কি করে? নাকি বাড়ি না থাকলেও ফোন ধরে লোকে?' বুঝতে না পেরে রেগে যাচ্ছে সে।

'আমার মনে হয় ও জড়িত,' মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। 'সোমবারে বাড়িতে টিনহা শ্যাটানোগাকে ফোন করেছিল কেউ। তাকে তিমিটার কথা বলেছে…'

'রোভার,' বাধা দিয়ে বলল মুসা। 'নাম যখন একটা রাখা হয়েছে, তিমি তিমি না করে রোভার বলতে দোষ কি?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে যাও, রোভারই,' মুসার কথা রাখল কিশোর। 'টিনহাকে ওশন ওয়ারল্ডে ফোন করা হয়নি, কারণ যে করেছে তার জানা আছে সোমবারে ফোন ধরবে না কেউ। জিমবা শ্যাটানোগার বাড়িতে করতেই পারবে না, কারণ তার লাইন কাটা।'

'আর ব্রাদার শিঁয়াওঁর মন্দিরেও করবে না,' রবিন যোগ করল, 'কারণ সে বোবা সেজেছে। কোন লাভ নেই ওখানে করে।'

'বাকি থাকল আর মাত্র একজন শ্যাটানোগা, যার বাড়িতে ফোন আছে,' বলল কিশোর। 'যে স্যান পেড্রোতে বাস করে, মাছ ধরার জন্যে বোট ভাড়া দেয়। হতে পারে, সে টিনহার আত্মীয়, তার ওখানেই ফোন করেছে লোকটা।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'গতরাতে উলফকে বলেছে টিনহা, বাপের জন্যেই নাকি তার কথা শুনছে।'

'বেশ,' গোমড়া মুখে বলল মুসা, 'ম্যারিবু নাহয় বাবাই হলো টিনহার, তাতে কি? দেয়ালের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?'

'সহজ,' বুঝিয়ে বলল কিশোর। 'টিনহা আর উলফ আমাদের কাছে মুখ খুলবে না। খুললেও মিছে কথা বলবে, আর উলফ কিছুই বলবে না। ওদের কাছ থেকে যেহেতু কিছু জানতে পারছি না আমরা, অন্যের কাছ থেকে ওদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। সে জন্যেই স্যান পেড্রোতে গিয়ে ম্যারিবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই, সে কতখানি জড়িত বোঝার জন্যে।'

'যদি বাড়ি না থাকে?' প্রশ্ন তুলল মুসা। 'মাছ ধরতে গিয়ে থাকে?'

'তাহলে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে, কিংবা অন্য জেলেদের সঙ্গে কথা বলব।

জিজ্ঞেস করব টিনহার সম্বন্ধে কি জানে, ম্যারিবুর কোন বন্ধু বা পরিচিত লোক আছে কিনা উলফ নামে। বোঝার চেষ্টা করব, রোভারকে রেখে আমরা যখন ফিরে আসছিলাম সেদিন, ওরাই বোট থেকে চোখ রেখেছিল কিনা আমাদের ওপর।'

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়াল মুসা, 'চান্স খুবই কম, তবু চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই। তা স্যান পেড্রোতে যাব কি করে? তিরিশ মাইলের কম না। বোরিস নিয়ে যাবে?'

'বললে তো যাবেই, কিন্তু উচিত হবে না। ইয়ার্ডে অনেক কাজ, বোরিস আর রোভার দুজনেই খুব ব্যস্ত।'

'তাহলে?'

'রোলস রয়েসটার কথা একেবারেই ভুলে গেছ? চাইলেই তো পেতে পারি আমরা ওটা।'

'ঠিকই তো। অনেকদিন চড়ি না তো, ভুলেই গেছি। ফোন করব রেন্ট আ রাইড কোম্পানিতে, হ্যানসনকে?'

'করে দিয়েছি আমি। এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই। চলো, বাইরে যাই।'

ওরা বেরোনোর কয়েক মিনিট পরেই ইয়ার্ডের খোলা গেট দিয়ে ঢুকল বিশাল এক গাড়ি, রাজকীয় চেহারা। পুরানো মডেলের এক চকচকে কালো রোলস রয়েস, জায়গায় জায়গায় সোনালি কাজ করা। এক আরবী শেখের জন্যে তৈরি হয়েছিল, শেখের পছন্দ হয়নি, নেয়নি, তারপর রেন্ট আ রাইড কোম্পানি রেখে দিয়েছে গাড়িটা। বাজিতে জিতে তিরিশ দিন ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিল একবার কিশোর, তিরিশ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর জোরজার করে আরও দুদিন ব্যবহার করতে পেরেছিল। তারপর আর পারবে না, কঠোর ভাবে বলে দিয়েছিল কোম্পানির ম্যানেজার। সেই সময় অগাস্ট নামে এক ইংরেজ কিশোরকে রক্তচক্ষু খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল তিন গোয়েন্দা। যাওয়ার সময় অগাস্ট ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে, তিন গোয়েন্দা যখনই চাইবে, তখনই তাদেরকে গাড়িটা দিয়ে সাহায্য করতে হবে কোম্পানির, খরচ-খরচা যা লাগে, সব তার।

অগাস্ট চলে যাওয়ার পর গাড়িটা ব্যবহারের তেমন প্রয়োজন পড়েনি, আজ পড়েছে।

গাড়ি থেকে নামল ধোপদুরস্ত পোশাক পরা ইংরেজ শোফার হ্যানসন। বিনীত ভঙ্গিতে সালাম জানাল তিন কিশোরকে।

এই ব্যাপারটা কিশোরের পছন্দ নয়, কিন্তু হ্যানসনকে বললে শোনে না। কর্তব্য পালন থেকে বিরত করা যায় না 'খাঁটি ইংরেজ বলে অহঙ্কারী' লোকটাকে।

প্রায় নিঃশব্দে ছুটে চলেছে রোলস রয়েস। তিরিশ মাইল পথ পাড়ি দেয়া কিছুই না ওটার শক্তিশালী ইঞ্জিনের জন্যে। স্যান পেড্রোতে পৌঁছল গাড়ি। ফোন বুক লেখা ঠিকানা টুকে নিয়েছে কিশোর। সেইন্ট পিটার স্ট্রীট খুঁজে বের করল হ্যানসন।

ডকের ধারে পথ। দু-ধারে পুরানো ভাঙাচোরা মলিন বাড়িঘর, বেশিরভাগই কাঠের। কয়েকটা স্টোর আছে, মাছ ধরার সরঞ্জাম, বড়শিতে গাঁথার জ্যান্ত টোপ আর চকোলেট-লজেন্স থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসই পাওয়া যায় ওগুলোতে।

একটা স্টোরে খোঁজ নিতেই ম্যারিবুর বাড়ি চিনিয়ে দিল। আশপাশের অন্যান্য বাড়ির চেয়ে সুরক্ষিত মনে হলো এটা, তিন তলা বিল্ডিঙ, মাটির নিচেও একটা তলা রয়েছে, তাতে অফিস। জানালায় লেখা রয়েছে ঃ চার্টার বোট ফিশিং।

জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল কিশোর, একটা ডেস্কের ওপর একটা ফোন, আর আশেপাশে কয়েকটা কাঠের চেয়ার। একটা র‍্যাকে ঝুলছে কিছু সাঁতারের পোশাক আর ডুবুরীর সরঞ্জাম।

দরজার দিকে চলল তিন গোয়েন্দা। এই সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটা লোক। আবার লাগিয়ে দিয়ে তালা আটকে দিল। ফিরে কিশোরকে দেখেই চমকে গেল। পকেটে চাবি রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'

লম্বা-পাতলা লোক, ঢালু কাঁধ, মুখে বয়েসের রেখা। পরনে মলিন নীল স্যুট, সাদা শার্ট, খয়েরি টাই।

লোকের চেহারা, পোশাক, আচার-ব্যবহার খুব খুঁটিয়ে দেখা কিশোরের স্বভাব। এসব থেকে লোকটা কেমন স্বভাব-চরিত্রের, কি করে না করে, বোঝার চেষ্টা করে। তার অনুমান খুব কমই ভুল হয়। এই লোকটাকে দেখে তার মনে হলো, কোন ছোট দোকানে কেরানী কিংবা হিসাব রক্ষকের কাজ করে, কিংবা হয়তো ঘড়ির কারিগর। শেষ কথাটা মনে হলো লোকটার ডান চোখের দিকে চেয়ে।

ডান চোখের নিচেটায় অদ্ভুত ভাবে কুঁচকে গেছে চামড়া, অনেকটা কাটা দাগের মত মনে হয়। হয় মনোকল পরে লোকটা, নয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা ম্যাগনিফাইং গ্লাস চোখে আটকে রাখে, ঘড়ির কারিগররা যে জিনিস ব্যবহার করে।

'মিস্টার ম্যারিবু শ্যাটানোগাকে খুঁজছি,' ভদ্রভাবে বলল কিশোর।

'বলো।'

'আপনি মিস্টার শ্যাটানোগা?'

'হ্যাঁ। ক্যাপটেন শ্যাটানোগা।'

অফিসে ফোন বাজল। দরজার দিকে ঘুরে তাকাল ম্যারিবু, খুলবে কিনা দ্বিধা করল, শেষে না খোলারই সিদ্ধান্ত নিল।

'আমাকে দিয়ে আর কি হবে?' ম্যারিবুর কণ্ঠে হতাশা। 'গত হপ্তায় ঝড়ে আমার বোট ডুবে গেছে। লোকে মাছ ধরার জন্যে ভাড়া নিতে আসে, বোট দিতে পারি না।'

'সরি,' বলল রবিন। 'আমরা জানতাম না।'

'তোমরা কি মাছ ধরতে যেতে চাও?'

শুদ্ধ ইংরেজি বলে ম্যারিবু। কথায় তেমন কোন টান নেই, তবে বলার ধরনে বোঝা যায়, ইংরেজি তার মাতৃভাষা নয়। হয়তো মেকসিকো থেকে এসেছে, ভাবল রবিন, অনেকদিন আমেরিকায় আছে।

'না না, মাছ নয়,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনার মেয়ের কাছ থেকে একটা খবর নিয়ে এসেছি।'

'আমার মেয়ে?' একটু যেন অবাক হলো ম্যারিবু। 'ও, টিনহার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'তা খবরটা কি?' জিজ্ঞেস করল ম্যারিবু।

'না, তেমন জরুরী কিছু নয়। ওশন ওয়ারল্ডে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এদিকে আসব বলেছিলাম। আপনাকে জানাতে বলল, আজ অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করবে সে।'

'অ,' একে একে কিশোর, রবিন আর মুসার ওপর নজর বোলাল ম্যারিবু। 'তোমরা তিন গোয়েন্দা?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। আবাক হয়েছে, কি করে ক্যাপটেন শ্যাটানোগা তাদের কথা জানল? তারপর মনে পড়ল, টিনহাকে একটা কার্ড দিয়েছিল কিশোর। তাদের কথা নিশ্চয় বাবাকে বলেছে টিনহা।

'তোমরা এসেছ, খুশি হলাম,' হেসে হাত বাড়িয়ে দিল ম্যারিবু। 'খাওয়ার সময় হয়েছে। চলো না কিছু খেয়ে নিই। কাছেই দোকান।'

ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মুসা। খাওয়ার আমন্ত্রণে কোন সময় না করে না সে।

খেতে খেতেই প্রচণ্ড ঝড় আর বোট হারানোর গল্প শোনাল ম্যারিবু।

বিংগো উলফ নামের এক লোককে মাছ ধরতে নিয়ে গিয়েছিল বাজা ক্যালিফোর্নিয়ায়। উপকূলের কয়েক মাইল দূরে থাকতেই কোন রকম জানান না দিয়ে আঘাত হানে ঝড়। বোট বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ম্যারিবু, কিন্তু ঢেউয়ের সঙ্গে কুলাতে পারেনি। কাত হয়ে ডুবে যায় বোট। কোন রকমে টিকে ছিল দুজনে, ভেসে ছিল, পরনে লাইফ-জ্যাকেট ছিল তাই রক্ষা। অবশেষে কোস্ট গার্ডের জাহাজ ওদেরকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে।

শুনে খুব দুঃখ পেল দুই সহকারী গোয়েন্দা। রবিন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, বোটটা বীমা করানো আছে কিনা, কিন্তু তার আগেই বলে উঠল কিশোর, 'আপনার মেয়ে খুব ভাল সাঁতারু, ক্যাপ্টেন। তিমির সঙ্গে যা সাঁতরায় না। ভাল ট্রেনার।'

'উঁ!...হ্যাঁ হ্যাঁ, ওশন ওয়ারল্ডে।'

'অনেকদিন ধরেই একাজ করছে, না?' জিজ্ঞেস করল রবিন। বুঝতে পেরেছে, টিনহার আলোচনা চালাতে চায় কিশোর।

'বেশ কয়েক বছর।'

'অনেক দূরে যেতে হয় রোজ, ওশন ওয়ারল্ড তো কম দূরে না,' কিশোর বলল। 'এখান থেকেই যায় বুঝি?'

আনমনা হয়ে মাথা ঝাঁকাল ম্যারিবু। অন্য কিছু ভাবছে, বোঝা যায়। কফি শেষ করল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আসলে হয়েছে কি,' তিন গোয়েন্দাকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছে যেন সে, 'তিমিকে ট্রেনিং দেয়ার ব্যাপারে মিস্টার উলফের খুব আগ্রহ। সান্তা মনিকায় পাহাড়ের ওপর তার একটা বাড়ি আছে।' বাড়িটার ঠিকানা দিল সে, যেটা আগের রাতেই চিনে এসেছে মুসা। 'একটা সুইমিং পুল আছে তার বাড়িতে। অনেক বড় পুল।'

রাস্তায় বেরোনোর আগে আর কিছু বলল না ম্যারিবু। আবার তিন গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা হবে, এই ইচ্ছে প্রকাশ করে, হাত মিলিয়ে বিদায় নিল।

ছেলেরা বার বার ধন্যবাদ দিল তাকে আতিথেয়তার জন্যে।

চলে যাচ্ছে লম্বা লোকটা। সেদিকে চেয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'হুঁম্ম্!' মুসার কথার জবাবে, না এমনি বলল কিশোর, বোঝা গেল না। হাঁটতে শুরু করল। মোড়ের কাছে গাড়ি রেখে এসেছে।

গাড়ি ছাড়ল হ্যানসন। গলি থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা। 'খুব ভাল লোক। আমাদেরকে খাওয়াল।'

'তাই নাকি?' ফিরে তাকাল একবার হ্যানসন, তারপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল আবার পথের ওপর। 'ভুল হয়েছে আপনাদের। গাড়ি যেখানে রেখেছিলাম, তার পাশেই একটা গ্যারেজ আছে, দেখেছিলেন? চাকার হাওয়া দিতে নিয়ে গিয়েছিলাম, দেখি পুরানো এক দোস্ত, মেকসিকান। সে বলল, ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোট ডুবে গেছে।'

'হ্যাঁ, বলেছে আমাদেরকে,' বলল রবিন।

'যে বলেছে, সে অন্য লোক, ক্যাপটেন শ্যাটানোগা নয়।'

'কেন নয়?' লম্বা লোকটা চলে যাওয়ার পর এই প্রথম কথা বলল কিশোর। ভাবে মনে হলো না অবাক হয়েছে, এটাই যেন আশা করছিল সে।

'কারণ, ক্যাপটেন শ্যাটানোগা এখন হাসপাতালে। খুব অসুস্থ। কড়া নিউমোনিয়া বাধিয়েছে। এতক্ষণ পানিতে থাকা, হবেই তো। কারও সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা নেই বেচারার।'

# পাঁচ

'লোকটা ক্যাপটেন শ্যাটানোগা সাজতে গেল কেন?' প্রশ্ন করল মুসা।

রকি বীচে ফিরে এসেছে তিন গোয়েন্দা, হেডকোয়ার্টারে বসেছে।

'লম্বা লোকটা আসলে কে?' রবিনের প্রশ্ন।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না কিশোর। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছে, চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ। হাতের তালুর দিকে চেয়ে বলল, 'আমি একটা আস্ত গাধা, বোকার সম্রাট, মাথামোটা বলদ।'

কেন, জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না রবিন, কিশোরের এই ধরনের কথার সঙ্গে সে পরিচিত। মুসাও চেয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।

'কেন জানো?' নিজেই ব্যাখ্যা করল গোয়েন্দাপ্রধান।

'আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করিনি। অফিসের বাইরে তখন লোকটাকে দেখেই বুঝেছি, ও ক্যাপটেন শ্যাটানোগা নয়, হতে পারে না। নাবিকের মত পোশাক পরেনি, হাত আর কাঁধের গঠন নাবিকের মত নয়। ওর ডান চোখের নিচে লক্ষ করেছ?'

'কুঁচকানো চামড়া?' রবিন বলল। 'করেছি। আমি দেখে ভেবেছিলাম স্বর্ণকার

বা ঘড়ির কারিগর। কিন্তু এমন আন্তরিক হয়ে গেল লোকটা, হ্যামবারগার কিনে খাওয়াল, ভুলেই গেলাম সব কিছু। হুতোম পেঁচার মত জমিয়ে বসে শুনে যাচ্ছিলাম ওর কথা...' কি বোকামিই না করে ফেলেছে ভেবে লাল হয়ে উঠল তার গাল।

'তখন আমিও বিশ্বাস করেছি তার কথা,' কিশোর বলল। 'শানকিতে ফেন দিয়ে চু-চু করে ডাক দিল আর অমনি খেতে চলে গেলাম। ছিহ্...'

'তুমি একা না, আমরাও গেছি,' কিশোর নিজেকে এত বেশি দোষারোপ করছে দেখে কষ্ট হলো রবিনের। 'একটা কথা কিন্তু ঠিক, নিজের পরিচয় ছাড়া আর কোন মিথ্যে বলেনি লোকটা...'

'হ্যাঁ, কয়েকটা সত্যি কথা বলেছে অবশ্য। ঝড়ে ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোট ডুবে যাওয়ার কথা বলেছে। কিংগো উলফের র‍্যাঞ্চের ঠিকানা দিয়েছে, সত্যিকার ঠিকানা। তারপর...'

কিশোরের মত সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতা নেই রবিনের, তবে স্মরণ শক্তি খুব ভাল। 'তারপর, বলেছে, তিমি ট্রেনিং দেয়ার ব্যাপারে খুব উৎসাহ উলফের—তার বাড়িতে যে মস্ত বড় একটা সুইমিং পুল আছে সেকথাও বলল।'

'বলেছে,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'কিন্তু এতে রহস্য কোথায়?'

'যেভাবে বলেছে সেটাই রহস্য,' বলল কিশোর। 'ইচ্ছে করেই উল্লেখ করেছে। আমাদের জানিয়েছে আসলে। কিন্তু টিনহার বাবা সাজতে গেল কেন? লোকটা কিভাবে বেরিয়ে এসেছিল, দেখেছ। দরজা বন্ধ করে তালা আটকাল, আমাদের দেখেই চমকে গেল, কেন? একটাই কারণ হতে পারে, চুরি করে ক্যাপটেনের অফিসে ঢুকেছিল সে, কিছু খুঁজছিল। শুধু অফিস না, হয়তো পুরো বাড়িই খুঁজেছে।'

'কি?' রবিন প্রশ্ন করল। 'লোকটাকে দেখে তো চোর মনে হলো না। কি খুঁজেছে?'

'তথ্য,' ভাবনার জগত থেকে ফিরে এল কিশোর। 'আমরা যে কারণে স্যান পেড্রো গিয়েছি, হয়তো একই কারণে সে-ও গিয়েছে—টিনহা আর ক্যাপটেন শ্যাটানোগা সম্পর্কে জানতে চায়। তারপর বেরিয়ে এসে আমাদের দেখে চমকে গিয়ে যা মুখে এসেছে বলেছে, নিজেকে ক্যাপটেন বলে চালিয়েছে, নইলে যদি প্রশ্ন করি ও কি করছিল ওখানে।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর? 'হয়েছে, চলো। ঘোড়া ছোটাইগে।' মুসাও উঠে দাঁড়াল, হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোরের দিকে, বুঝতে পারছে না।

রবিন বলল, 'উলফের বাড়ি যাচ্ছি?'

'আরি সব্বোনাশ, এখন?' আঁতকে উঠল মুসা। কিশোরের মুখের দিকে চেয়ে মত পরিবর্তন করে বলল, 'ঠিক আছে, যেতে আপত্তি নেই, তবে আগে পেটে কিছু পড়া দরকার। কিংবা আরেক কাজ করতে পারি, মেরিচাচীর কাছ থেকে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ চেয়ে আনতে পারি, সাইকেল চালাতে চালাতে খাব। কয়েক টুকরো ভাজা মাংসও দেবেন চাচী যদি চাই, আর সকালে দেখলাম সুইস পনির বানাচ্ছেন...'

ওশন ওয়ারল্ড বন্ধ হতে দেরি আছে। তাড়াহুড়ো করল না ছেলেরা, শান্ত ভাবেই সাইকেল চালাল। পার্কিং লটে এসে সাদা পিকআপটার কাছে অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে আসতে দেখা গেল টিনহা শ্যাটানোগাকে।

শীতটা যেতে চাইছে না, এই বিকেলেও বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। তবে টিনহার পোশাক দেখে মনে হলো না তার শীত লাগছে। হাতে একটা টেরিক্লথের তৈরি আলখেল্লা ধরনের পোশাক অবহেলায় ঝুলছে। মনে মনে তাকে পেঙ্গুইনের সঙ্গে তুলনা করল কিশোর। সেই টু-পীস সাঁতারের পোশাক পরনে, পায়ে সাধারণ স্যাণ্ডাল।

'আরে, তোমরা,' তিন গোয়েন্দাকে দেখে বলে উঠল সে, 'আমাকে খুঁজছ?'

'মিস শ্যাটানোগা,' সামনে এগোল কিশোর, 'বুঝতে পারছি, অসময়ে এসে পড়েছি। সারাদিন কাজ করে নিশ্চয় ক্লান্ত এখন আপনি। তবু যদি কয়েক মিনিট সময় দেন...'

'আমি ক্লান্ত নই,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল টিনহা, 'তবে খুব ব্যস্ত। তোমরা কাল এসো।'

'আসলে, এখুনি বলা দরকার,' আরেক পা সামনে বাড়ল কিশোর। 'ব্যাপারটা...'

'কাল,' আবার বলল টিনহা। 'এই দুপুর নাগাদ,' সামনে পা বাড়াল, আশা করছে কিশোর পথ ছেড়ে দেবে।

কিন্তু কিশোর সরল না, আগের জায়গায়ই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। টিনহার মুখের দিকে চেয়ে লম্বা দম নিল। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল, 'রোভার।'

থমকে গেল টিনহা। আলখেল্লাটা কাঁধে ফেলে কোমরে দুই হাত রেখে দাঁড়াল, বদলে গেল কণ্ঠস্বর, 'রোভারের পেছনে লেগেছ কেন?'

'পেছনে লাগিনি,' হাসার চেষ্টা করল কিশোর। 'মিস্টার উলফের পুলে ও আছে জেনে খুশি হয়েছি। এ-ও জানি, ওর যত্ন নিচ্ছেন আপনি। কয়েকটা কথা জানতে চাই আপনার কাছে।'

'আপনাকে সাহায্য করতে চাই আমরা, মিস শ্যাটানোগা,' নরম গলায় বলল রবিন। 'বিশ্বাস করুন।'

'কিভাবে?' রবিনের দিকে ঘুরে চাইল টিনহা, কোমর থেকে হাত সরায়নি। 'কিভাবে সাহায্য করবে?'

'আমাদের সন্দেহ, কেউ আপনার ওপর গুপ্তচরগিরি করছে,' মুসা বলল। 'আজ স্যান পেড্রোতে গিয়েছিলাম। ক্যাপটেন শ্যাটানোগার অফিস থেকে একটা লোককে বেরোতে দেখলাম। আমাদের দেখে চমকে গেল। আপনার বাবা বলে নিজেকে চালানোর চেষ্টা করল।'

'ও আপনার বাবা হতেই পারে না, তাই না?' মুসার কথার পিঠে বলল কিশোর। 'আপনার বাবা জাহাজডুবিতে অসুস্থ হয়ে এখন হাসপাতালে।'

দ্বিধা করছে টিনহা, চোখের কড়া দৃষ্টি দূর হয়ে গেছে। ভাবছে কি করবে।

হাসল সে। 'বুঝতে পারছি তোমরা সত্যিই গোয়েন্দা।'

'এক্কেবারে,' মুসাও হেসে জবাব দিল। 'আমাদের কার্ডেই তো লেখা রয়েছে।'

'ও-কে,' আলখেল্লার পকেট হাতড়ে গাড়ির চাবি বের করল টিনহা। 'চলো না, গাড়িতে বসেই কথা হবে।'

'থ্যাংক ইউ, মিস শ্যাটানোগা,' রাজি হলো কিশোর। 'ভালই হয় তাহলে।'

'পাশা,' গাড়ির দরজার তালা খুলতে খুলতে বলল টিনহা, 'তোমাকে শুধু পাশা বলেই ডাকব।'

'কিশোর।'

'ও-কে, কিশোর।...তোমাকে শুধু মুসা, আর তোমাকে রবিন। আপত্তি নেই তো?'

'না না, আপত্তি কিসের?' তাড়াতাড়ি বলল রবিন।

ওদের দিকে চেয়ে হাসল টিনহা। 'এসো, ওঠো।'

ড্রাইভারের পাশে দুজনের জায়গা হয়। নিজে থেকেই বলল মুসা, 'তোমরা বসো, আমি পেছনে গিয়ে বসছি। কিশোর, যা যা কথা হয়, পরে আমাকে সব বোলো।'

টিনহার পাশে বসেছে কিশোর, তার পাশে রবিন। হাইওয়ের দিকে চেয়ে কি ভাবছে টিনহা। সামনের একটা ট্রাফিক পোস্টে লাল আলো। গাড়ি থামিয়ে সবুজের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বলল, 'ওই যে লোকটা, যে বাবার অফিসে ঢুকেছিল, চেহারা কেমন তার?'

নিখুঁত বর্ণনা দিল কিশোর।

মাথা নাড়ল টিনহা। 'চিনলাম না'। হতে পারে বাবার কোন বন্ধু...কিংবা তার বিরুদ্ধে গোলমাল পাকাতে চায় এমন কেউ।'

সবুজ আলো জ্বলছে।

'ও-কে,' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল টিনহা, 'তো বলো কি বলবে। কি জানতে চাও?'

'গোড়া থেকে সব,' বলল কিশোর। 'সোমবার সকালে স্যান পেড্রোতে উলফ আপনাকে টেলিফোন করার পর যা যা ঘটেছে সব। চরায় আটকা পড়া তিমিটা বিনকিউলার দিয়ে ও-ই তো দেখেছে, নাকি?'

# ছয়

'সেদিন সকালে হাসপাতালে বাবাকে দেখে সবে ফিরে এসেছি,' শুরু করল টিনহা, 'ওর অফিসে ফোন বাজল। ধরলাম। বিংগো উলফ। দক্ষিণ অঞ্চলের লোক, বাড়ি খুব সম্ভব অ্যালাবামায়। এর আগেও দু-তিনবার দেখেছি ওকে, বাবার সঙ্গে মাছ ধরতে গেছে। ফোনে উলফ বলল, সৈকতে আটকে পড়া একটা তিমি দেখেছে সে।'

বলে গেল টিনহা, কিভাবে উদ্ধার করেছে ওরা তিমিটাকে। তার দুজন

মেকসিকান বন্ধুকে নিয়ে গেছে ট্রাকসহ। ক্রেনের সাহায্যে তিমিটাকে ট্রাকে তুলেছে, ভেজা স্পঞ্জ দিয়ে জড়িয়ে বেঁধেছে সারা গা, যাতে ডিহাইড্রেটেড না হয়। তারপর তাড়াতাড়ি এনে ছেড়ে দিয়েছে উলফের সুইমিং পুলে, তারই অনুরোধে। টিনহা তিমিটার নাম রেখেছে রোভার, ওটার সঙ্গে সাঁতরেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ওটার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে।

একটা স্টোর থেকে জ্যান্ত মাছ জোগাড় করে দিয়েছে উলফ, তিমিটার খাবার জন্যে। ভালই চলছিল সব কিছু। খুব দ্রুত শিখে নিচ্ছিল রোভার, বুদ্ধিমান জীব তো।

'সব তিমিই বুদ্ধিমান,' সান্তা মনিকার দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল টিনহা। 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধির পরিচয় দেয়, হাজার হোক, এতবড় একটা মগজ। কিন্তু রোভারের বুদ্ধি যেন আর সব তিমিকে ছাড়িয়ে গেছে। অনেক বছর ধরে তিমিকে ট্রেনিং দিচ্ছি, কিন্তু ওর মত এত দ্রুত কেউ শিখতে পারেনি। বয়েস আর কত হবে, বড়জোর দুই—মানুষের তুলনায় অবশ্য পাঁচ কিংবা ছয়, বাঁচে তো মানুষের তিন ভাগের এক ভাগ সময়—কিন্তু দশ বছরের বুদ্ধিমান ছেলেকে ছাড়িয়ে গেছে ওর বুদ্ধি।'

তারপর উলফের বাড়িতে সেদিন কি হয়েছে, বলল টিনহা।

রোভারকে মাছ খাওয়ানো শেষ হলো। টিনহা ঠিক করল, স্যান পেড্রোতে যাওয়ার পথে হাসপাতালে নেমে বাবাকে আরেকবার দেখে যাবে। গাড়িতে করে তাকে পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করল উলফকে। পুলের ধারে দাঁড়িয়েছিল উলফ, রোদে চকচক করছিল তার টাক।

হিসেবী ভঙ্গিতে টিনহার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ উলফ।

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল টিনহা। বলল, 'আগামীকাল ওশন ওয়ারল্ডে লোক পাঠাব, ওরা তিমিটাকে সাগরে ছেড়ে দিয়ে আসবে,' বলেই গাড়িপথের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

থামাল তাকে উলফ। 'এক মিনিট, টিনহা। একটা কথা তোমার জানা দরকার, তোমার বাবা সম্পর্কে।'

'তোমার বাবা চোরাচালানী। টেপ রেকর্ডার, পকেট রেডিও, আরও নানারকম ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র মেকসিকোতে নিয়ে গিয়ে তিন-চার গুণ দামে বিক্রি করে। কয়েক বছর ধরে করছে একাজ।'

চুপ করে রইল টিনহা। উলফের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না। তবে অবিশ্বাসও করতে পারল না। কি জানি, হতেও পারে। মাঝে মধ্যেই মুখ ফসকে বেশি কথা বলে ফেলে বাবা, উলফের কাছেও হয়তো বলেছিল। বাবাকে ভালবাসে টিনহা, আর দশটা মেয়ের চেয়ে বেশিই বাসে। ছোটবেলায় টিনহার মা মারা গেছে, তারপর আর বিয়ে করেনি বাবা, মা-বাবা দুজনের আদর দিয়েই মানুষ করেছে। এটাও অবশ্য অস্বীকার করে না টিনহা, তার বাবা পুরোপুরি সৎ নাগরিক নয়।

'গত ট্রিপে বেশ কিছু মাল নিয়ে চলেছিল,' আবার বলল উলফ। 'বেশিরভাগই পকেট ক্যালকুলেটর, মেকসিকোয় খুব চাহিদা। ঝড়ে পড়ে বোট ডুবল, সেই সঙ্গে

মালগুলোও।'

তবুও কিছু বলল না টিনহা।

'বিশ তিরিশ হাজার ডলারের কম দাম হবে না, আমেরিকাতেই,' বলে চলল উলফ। 'তার অর্ধেক আমার। দুজনে শেয়ারে ব্যবসা করতাম আমরা। ওয়াটারপ্রুফ কনটেইনারে রয়েছে ক্যালকুলেটরগুলো, পানি ঢুকতে পারবে না, নষ্ট হবে না। আমার ইনভেস্টমেন্ট আমি হারাতে রাজি নই। বোটটা খুঁজে বের করে জিনিসগুলো তুলে আনা দরকার। তুমি আমাকে সাহায্য করবে,' শেষ কথাটা বেশ জোর দিয়েই বলল সে। ভয় দেখানোর একটা ভঙ্গিও রয়েছে। টিনহার মুখের দিকে তাকাল উলফ। 'তুমি আর তোমার এই তিমি। করছ তো সাহায্য?'

জবাব দেয়ার আগে ভালমত ভেবে দেখেছে টিনহা। ও জানে, আমেরিকান সরকার ধরতে পারবে না তার বাবাকে, বেআইনী কাজ বলতে পারবে না। পকেট ক্যালকুলেটর কিনে আমেরিকা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার মাঝেও বেআইনী কিছু নেই। আর যাই করুক, আমেরিকান পুলিশের ভয় দেখিয়ে টিনহাকে ব্লেকমেল করতে পারবে না উলফ। মেকসিকান পুলিশের ভয় দেখিয়েও লাভ নেই। কারণ হাতে-নাতে ধরতে না পারলে কোন চোরাচালানীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারবে না ওরাও।

তবে সমস্যা হলো তার বাবাকে নিয়ে। বোটের বীমা করায়নি, কাজেই গেছে ওটা। নিজেরও চিকিৎসা-বীমা নেই। অথচ হাসপাতালে রোজ শ'য়ে শ'য়ে ডলার খরচ, আসবে কোথা থেকে? যদি উলফকে সাহায্য করে টিনহা, বোটটা খুঁজে পায়, ক্যালকুলেটরগুলো তুলতে পারে, শেয়ারের অর্ধেক টাকা মিলবে। দশ পনেরো হাজার দিয়ে হাসপাতালের বিল তো মেটাতে পারবে।

ভেবে দেখেছে টিনহা, সে-ও কোন বেআইনী কাজ করছে না। বোটটা তাদের। সেটা খোঁজার মধ্যে দোষের কিছু নেই। বরং এটাই স্বাভাবিক।

'কাজেই রাজি হয়ে গেলাম,' পাহাড়ী পথের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল টিনহা। ওপরের দিকে উঠছে এখন গাড়ি। 'বোটটা খুঁজে বের করার জন্যেই রোভারকে ট্রেনিং দিচ্ছি।'

চুপচাপ সব শুনেছে এতক্ষণ কিশোর, একটি কথাও বলেনি। আরও এক মিনিট চুপ থেকে বলল, 'তাহলে এই ব্যাপার। রোভারকে কলার পরিয়েছেন এ-কারণেই। গলায় একটা টেলিভিশন ক্যামেরা ঝুলিয়ে দেবেন, গভীর পানিতে ডুব দিয়ে ছবি তুলে আনবে। ভাল বুদ্ধি। দুনিয়ার যে কোন ভাল ডুবুরীর চেয়ে ভাল পারবে রোভার, ওর মত এত নিচে কোন ডুবুরীই নামতে পারবে না। অনেক কম সময়ে অনেক বেশি জায়গা ঘুরে দেখতে পারবে।

'ঠিক বুঝেছ,' হেসে প্রশংসা করল টিনহা। 'তুমি আসলেই বুদ্ধিমান, তোমার বয়েসী অনেক কিশোরের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।'

হাসি ফিরিয়ে দিল কিশোর। 'রোভারের চেয়েও বেশি?'

তার রসিকতায় আবার হাসল টিনহা। 'ও-কে। এবার তোমার কথা বলো। রোভারের ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন? কি তদন্ত করছ তোমরা?'

ভাবল কিশোর। একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণার কথা বলবে? সত্যি বলাই স্থির করল সে, টিনহা যখন তার সঙ্গে মিথ্যে বলেনি, সে-ও বলবে না। 'আমাদের এক মক্কেল—নাম বলতে পারব না, বলেনি সে—তিমিটাকে খুঁজে বের করে সাগরে ফিরিয়ে দিতে পারলে একশো ডলার পুরস্কার দেবে বলেছে।'

'সাগরে ফিরিয়ে দিতে পারলে! কেন? কি লাভ তার?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল কিশোর।

'হুঁ? তো অর্ধেক কাজ তো তোমরা সেরে ফেলেছ,' উলফের বিরাট র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে এনে গাড়ি রাখল টিনহা। 'বাকি কাজটা আমাকেই করতে দাও। পারলে সাহায্য কোরো আমাকে।'

'নিশ্চয় করব,' এতক্ষণে মুখ খুলল রবিন। 'কিন্তু কিভাবে?'

'ডাইভিং জানো?'

কিশোর জানাল, জানে তিনজনেই। তবে এ-ব্যাপারে মুসা ওস্তাদ, দক্ষ সাঁতারু, একথাও বলল।

'দারুণ,' বলল টিনহা, 'তোমাদের ওপর ভক্তি বাড়ছে আমার। তাহলে এক সঙ্গে কাজ করছি আমরা? যত তাড়াতাড়ি পারি রোভারকে সাগরে ছেড়ে দেব। তবে ছাড়লে চলে যাবে না এ-ব্যাপারে শিওর হয়ে নিতে হবে। তারপর বাবার বোটটা খুঁজতে সাহায্য করবে তোমরা আমাকে। কি বলো?'

'রাজি,' একই সঙ্গে জবাব দিল রবিন আর কিশোর। ওরা তো এইই চায়, রহস্য, রোমাঞ্চ, উত্তেজনা। খুশি হয়ে উঠেছে। ছুটিটা ভালই কাটবে। সাগরে ডুবন্ত একটা বোট উদ্ধার, তিমির সাহায্যে, চমৎকার!

'এসো আমার সঙ্গে,' ধাক্কা দিয়ে এক পাশের দরজা খুলে ফেলল টিনহা, 'রোভারের সঙ্গে দেখা করবে।'

চোখ বুজে পানিতে চুপচাপ ভেসে রয়েছে রোভার, শরীরের অর্ধেক পানির নিচে। পুলের আলো জ্বেলে দিল টিনহা, সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল তিমিটা। নড়ে উঠল। সাঁতরে চলে এল কিনারে, প্রভু বাড়ি ফিরলে কুকুর যে চোখে তাকায়, সেই দৃষ্টি। পাখনা আর লেজ নেড়ে স্বাগত জানাল টিনহাকে।

মনে হলো, তিন গোয়েন্দাকেও চিনতে পেরেছে সে। ওরা পুলের কিনারে বসে পানিতে হাত রাখল। সবার হাতেই ঠোঁট ছুঁইয়ে আনন্দ প্রকাশ করল রোভার।

'খাইছে,' দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার। 'ও আমাদের চিনতে পেরেছে।'

'চিনবে না মানে?' টিনহা বলল। 'ওর প্রাণ বাঁচিয়েছ তোমরা। ও কি মানুষের মত অকৃতজ্ঞ যে ভুলে যাবে?'

'কিন্তু একটা…'

কনুয়ের গুঁতো মেরে তাকে থামিয়ে দিল রবিন তাড়াতাড়ি, নইলে মুসা বলেই ফেলছিল 'একটা সাধারণ তিমি', তাতে মনঃক্ষুণ্ণ হত টিনহা। মুসাকে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে যা যা কথা হয়েছে, সংক্ষেপে সব জানাল রবিন।

রোভারকে আগে খাওয়াল টিনহা। তারপর ফ্লিপার পরে নিল পায়ে। পানিতে পা নামাতে যাচ্ছিল, থেমে গেল একটা শব্দে। ঘুরে তাকাল। র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে

বেরিয়ে এদিকেই আসছে দুজন লোক।

মুসার কাছে চেহারার বর্ণনা শুনেছে, দেখেই উলফকে চিনতে পারল কিশোর। অন্য লোকটাকে চিনল তিনজনেই। সেই লম্বা লোকটা, যে নিজেকে টিনহার বাবা বলে পরিচয় দিয়েছিল।

'আপনি এখানে আসবেন না বলেছিলেন,' উলফকে দেখে রেগে গেছে টিনহা। 'খবরদার আর আসবেন না। রোভারের ট্রেনিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসতে পারবেন না।'

জবাব দিল না উলফ। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে আছে। 'ওরা কারা?' কারা উচ্চারণ করল ও 'কা-আরা'।

'আমার বন্ধু,' বলল টিনহা। 'স্কুবা ডাইভার। আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল উলফ, যদিও বোঝা গেল, এসব পছন্দ করছে না সে। কিন্তু টিনহা বলেছে তার বন্ধু, তাই আর প্রতিবাদও করতে পারল না।

উলফের পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখছে টিনহা। 'বন্ধুটি কে?'

'আমার নাম বনেট,' নিজেই পরিচয় দিল লম্বা লোকটা। 'নীল বনেট। উলফের পুরানো বন্ধু। আপনার বাবারও বন্ধু মিস।' হেসে বলল, 'মেকসিকো থেকে এসেছি।'

'অ। ও-কে।'

কিশোর বুঝতে পারছে, নামটা টিনহার অপরিচিত, আগে কখনও দেখেনি লোকটাকে। কিন্তু তার 'মেকসিকো থেকে এসেছি' কথাটা বলার পেছনে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে।

তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে বনেটের হাসি বিস্তৃত হলো। 'তাহলে তোমরা স্কুবা ডাইভার। ওশন ওয়ারল্ডে মিস শ্যাটানোগার সঙ্গে কাজ করো?'

'মাঝে মাঝে,' চট করে জবাব দিল টিনহা, 'স্থায়ী কিছু না। ও, সরি, পরিচয় করিয়ে দিই। কিশোর, মুসা, রবিন।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' আগে থেকেই যে চেনে এটা সামান্যতম প্রকাশ পেল না লোকটার দৃষ্টিতে, হাসিমুখে হাত মেলাল তিন গোয়েন্দার সঙ্গে।

হয় স্মরণশক্তি সাংঘাতিক খারাপ, নয়তো দিনের বেলায়ও ঘুমের ঘোরে হাঁটে ব্যাটা, লোকের সঙ্গে কথা বলে, ভাবল কিশোর। কিন্তু এর কোনটাই বিশ্বাস করতে পারল না সে। আসলে লোকটা একটা মস্ত ধড়িবাজ, তাদের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে, এটা জানাতে চায় না টিনহাকে।

কেন? অবাক লাগছে কিশোরের। কি লুকাতে চায় নীল বনেট?

# সাত

'নীল বনেটের,' বলল কিশোর, 'এই রহস্যের সঙ্গে কি সম্পর্ক?'

প্রশ্নটা করেছে সে নিজেকেই। মুখ ফুটে ভাবনা বলা যেতে পারে একে।

টিনহার সঙ্গে উলফের বাড়ি গেছে, তার পরের দিনের ঘটনা। স্যালভিজ ইয়ার্ডের গেটে অপেক্ষা করতে করতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে তিন গোয়েন্দা, বার বার তাকাচ্ছে পথের দিকে। বিকেলে ওশন ওয়ারল্ড থেকে ছুটি নিয়ে লাঞ্চ খেয়ে সোজা এখানে চলে আসার কথা টিনহার, তিন গোয়েন্দাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা।

'এই কাহিনীর একটা অংশ বনেট,' আপনমনেই বিড়বিড় করল কিশোর। 'টিনহা ওকে চেনে না। কিন্তু লোকটা সব জানে বলে মনে হলো, 'টিনহার বাবার মেকসিকোতে ট্রিপ দেয়ার কথাও নিশ্চয় অজানা নয়।'

'ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বাড়িতেও সার্চ করতে গিয়েছিল,' রবিন বলল।

'ক্যাপটেন শ্যাটানোগার নাকি আবার বন্ধু,' বলল রবিন। 'তাহলে চুরি করে তার বাড়িতে ঢোকে কেন?'

'উলফেরও বন্ধু,' কিশোর বলল। 'সেদিন বোটে যে দুজনকে দেখেছিলাম, একজন বনেট হতে পারে।'

'কারও ভাল বন্ধু নয় সে। উলফকেও তো জানাতে চাইল না, আমাদের সঙ্গে স্যান পেড্রোতে তার পরিচয় হয়েছে।'

'একটা কথা ঠিক,' মুসা মুখ খুলল, 'আগে থেকেই ও আমাদের নাম জানে, নইলে স্যান পেড্রোতে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনল কিভাবে?'

'আমিও তাই বলি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে পথের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'ব্যাটা সবই জানে। স্মাগলিঙের কথা জানে, ঝড়ে বোট ডুবে যাওয়ার কথা জানে, তিমির সাহায্যে পকেট ক্যালকুলেটর উদ্ধারের কথাও জানে। শুধু বুঝতে পারছি না, ও এর মাঝে আসছে কি...' চুপ হয়ে গেল সে। পথের মোড়ে দেখা দিয়েছে সাদা পিকআপ।

ছুটে গিয়ে নিজের ঘর থেকে ছোট একটা ধাতব বাক্স নিয়ে এল কিশোর।

পিকআপে উঠল তিন গোয়েন্দা, আগের দিনের মতই কিশোর আর রবিন সামনে, মুসা পেছনে।

বাক্সটা টিনহাকে দেখিয়ে বলল কিশোর, 'এই জিনিসই চেয়েছিলেন আপনি।'

'বানিয়ে ফেলেছ?' খুশি হলো টিনহা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ভোর পাঁচটায় উঠে কাজে লেগেছিল, আগের রাতে নির্দেশ পেয়েছে টিনহার কাছ থেকে, সারাটা সকাল ব্যয় করে বানিয়েছে জিনিসটা। বাক্সটা কি করে খোলে দেখাল সে।

ভেতরে একটা টেপ রেকর্ডার—ব্যাটারিতে চলে, একটা মাইক্রোফোন আর স্পীকারও আছে। এমনভাবে সাজিয়েছে জিনিসগুলো, বাক্সটা বন্ধ করে রাখলেও রেকর্ড কিংবা ব্রডকাস্ট করতে পারবে। বাথটাবে পরীক্ষা করে দেখেছে। পানির নিচে নিখুঁত কাজ করে যন্ত্রটা, এক বিন্দু পানি ঢোকে না বাক্সের ভেতরে।

'ইলেকট্রনিক্সের যাদুকর তুমি,' প্রশংসা করল টিনহা।

'আরে না না, কি যে বলেন। সাধারণ একটা হবি,' মুখে বিনয় প্রকাশ করছে বটে কিশোর, কিন্তু রবিন জানে নিজেকে টমাস এডিসন মনে করে সে। তবে

ইলেকট্রনিক্সের টুকটাক কাজে যে তার বন্ধু ওস্তাদ এটা স্বীকার করতেই হয়। ওই তো, চোখের সামনেই তো রয়েছে কিশোরের অ্যাসেমবল করা একটা জিনিস।

সঙ্গে স্কুবা মাস্ক আর ফ্লিপার নিয়েছে তিন গোয়েন্দা। র‍্যাঞ্চে পৌঁছে পোশাক বদলে সুইম স্যুট পরে নিল। পুলের কাছে জড় হয়েছে সবাই।

উলফ কিংবা তার বন্ধু নীল বনেটকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

'আমাদের কাজে নাক গলাতে নিষেধ করে দিয়েছি ওদের,' বলল টিনহা। 'যদি না শোনে...' বাক্যটা শেষ করল না সে।

'না শুনলেও না করে পারবেন না, তাই না?' নরম গলায় বলল রবিন।

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল টিনহা। 'ঠিকই বলেছ, পারব না। বাবার খুব টাকার দরকার। ওই মালগুলো খুঁজে আনতেই হবে।'

'আপনার বাবা কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ভাল না। তবে জান খুব শক্ত, খাঁটি মেকসিকান বুড়ো তো,' বেশ গর্বের সঙ্গেই বলল টিনহা। 'ডাক্তাররা বলছে, ভাল হয়ে যাবে। রোজ কয়েক মিনিট দেখা করার সময় দেয়, বাবা বিশেষ কিছু বলতে পারে না। একটা কথাই বার বার বলে...' থামল সে, টেনেটুনে পায়ে জায়গামত লাগিয়ে নিল ফ্লিপার, তারপর বলল, 'তোমরা গোয়েন্দা। হয়তো কিছু বুঝতে পারবে। বাবা বলে ঃ দুটো পোলের দিকে নজর রাখবে। একই লাইনে রাখবে।'

পুলে নামল টিনহা। পানির তলা দিয়ে উড়ে এসে তাকে স্বাগত জানাল রোভার।

'দুটো পোল,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হলো কিশোরের, 'একই লাইনে রাখবে।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল। 'কিছু বুঝতে পেরেছ?'

'পোল; পোলিশকে বুঝিয়েছে হয়তো,' বলল রবিন। 'নীল বনেট পোল্যাণ্ডের লোক হতে পারে। নামটা ওরকম, কথায় টান নেই বটে, কিন্তু বলার ভঙ্গি...'

'লক্ষ করেছ তাহলে,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'বলার ভঙ্গির মধ্যে পোলিশ একটা গন্ধ রয়েছে। আচ্ছা, একজন যদি বনেট হয়, আরেকজন কে?' মুসার দিকে চেয়ে বলল সে।

'আমাকে মাপ করো, বলতে পারব না।' পুলের দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'আরে দেখো, দেখো!'

পুলের মধ্যে চক্কর দিচ্ছে রোভার, তার পিঠে সওয়ার টিনহা, জড়িয়ে ধরে রেখেছে দুই বাহু দিয়ে।

পরের আধ ঘণ্টা রোভার আর টিনহার খেলা দেখল তিন গোয়েন্দা। আনাড়ি যে কেউ দেখলে বলবে খেলা, কিন্তু টিনহা জানে, এটা খেলা নয়, কঠিন ট্রেনিং। ওর বাধ্য করে নিচ্ছে তিমিটাকে। কোন ইঙ্গিতে কি করতে হবে বোঝাচ্ছে।

মানুষ আর তিমিতে আজব বন্ধুত্ব। ভাবল মুসা। কাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে, একে অন্যের মনের কথা পড়তে পারছে টিনহা আর রোভার। টিনহার মুখের সামান্যতম ভাব পরিবর্তনেরও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটছে তিমিটার মাঝে।

রোভারকে খাওয়াল টিনহা। তিন গোয়েন্দাকে পুলে নেমে তিমিটার সঙ্গে

খেলতে বলল।

রোভারের পাশে সাঁতরাতে প্রথম একটু ভয় ভয় করল মুসার, রোভার তার গায়ে ঠোঁট ঘষতে এলেই ভয় পেয়ে সরে গেল, আস্তে আস্তে সহজ হয়ে এল সে। রবিন আর কিশোরের চেয়ে তার সঙ্গেই বেশি বন্ধুত্ব হয়ে গেল বিশাল, বুদ্ধিমান জীবটার। টিটকারি মারতেও ছাড়ল না একবার রবিন। 'গায়েগতরে এক রকম তো, কাজেই দোস্ত।'

কিছু মনে করল না মুসা, হাসল শুধু।

'দেখাচ্ছে ভালই,' মুসাকে বলল টিনহা। 'কিশোর, তোমার যন্ত্রটা কাজে লাগাও।'

পুলের অন্য প্রান্তে ভাসছে রোভার। ওখানেই থাকতে শিখিয়েছে টিনহা, না ডাকলে আর কাছে আসবে না।

'দেখি, দাও আমার কাছে,' কিশোরের হাত থেকে রেকর্ডারটা নিল টিনহা। রেকর্ডিং সুইচ টিপে দিল। কোমরে একটা ওয়েটবেল্ট পরে নিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল পুলে। ইঙ্গিত পেয়ে রোভারও ডাইভ দিয়ে চলে গেল পুলের তলায়।

তাজ্জব হয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দা। টিনহা ডুব দিয়েছে তো দিয়েছেই, ওঠার নাম নেই। এতক্ষণ দম রাখছে কি করে! পরিষ্কার পানিতে দেখা যাচ্ছে তিমির মুখের কাছে যন্ত্রটা ধরে রেখেছে টিনহা, আরেক হাতের আঙুল নাড়ছে, মাঝেমধ্যে মটকাচ্ছে—দেখেই অনুমান করা যায়।

প্রায় দুই মিনিট পর ভেসে উঠল টিনহা। আস্তে আস্তে দম নিচ্ছে, ছাড়ছে, তাড়াহুড়ো করছে না। ফুসফুসকে শান্ত করে হাসল। ডেকে বলল, 'রেকর্ড করেছি। শোনা যাক, কেমন উঠেছে।'

টেপটা শুরুতে গুটিয়ে নিল কিশোর, তারপর প্লে করল। প্রথমে ঢেউয়ের মৃদু ছলাতছল ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। তারপর কয়েকটা মটমট, টিনহার আঙুল ফুটানোর আওয়াজ।

তারপর স্পীকারে স্পষ্ট ভেসে এল পাখির কাকলীর মত শব্দ, একবার উঁচু পর্দায় উঠেছে, আবার নামছে, সঙ্গে করতালি দিয়ে সঙ্গত করা হচ্ছে যেন।

হাতহালি বাদ দিলে একেবারে পাখি, ভাবল কিশোর। তবে অনেক বেশি জোরাল, গম্ভীর, কম্পন সৃষ্টি করার ক্ষমতা অনেক বেশি। এ-জাতীয় শব্দ আগে কখনও শোনেনি সে, ডাঙার কোন কিছুর সঙ্গেই পুরোপুরি তুলনা করা যায় না।

'রোভার?' ফিসফিস করে বলল রবিন, জোরে বললে যেন আবেশ নষ্ট হবে। 'রোভারের গান?'

'গান বলো, কথা বলো, যা খুশি বলতে পারো,' বলল টিনহা। 'এরকম শব্দ করেই ভাব প্রকাশ করে তিমি। তিমির ভাষা বোঝা সম্ভব হয়নি। হলে হয়তো দেখা যাবে, আমাদের কথার মতই অর্থবহ, জটিল ওদের কথাও।'

ক্লিপার খুলে নিল টিনহা। 'তবে মানুষের মত ঝগড়া করে না ওরা, লড়াই করে না। মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সভ্য। মিথ্যেও বলে না নিশ্চয়। কথা বলেই বা কি লাভ, যদি সেটাকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে খালি খারাপের দিকে নিয়ে যাই?'

'আবার শুনি?' মুসা অনুরোধ করল।

'দাঁড়াও, আগে রোভারকে শুনিয়ে নিই।'

টেপটা আবার শুরুতে এনে প্লে টিপে যন্ত্রটা টিনহার হাতে দিল কিশোর। পুলের কিনারে ঝুঁকে বাক্সটা পানির তলায় নিয়ে গেল টিনহা। রোভারকে লক্ষ করছে তিন গোয়েন্দা।

আরাম করে শুয়ে আছে পুলের তলায় রোভার। হঠাৎ শিহরণ খেলে গেল বিশাল শরীরটায়। শরীরের দুপাশে টান টান হয়ে গেল পাখনাগুলো। শাঁ করে এক ছুটে চলে এল পুলের এপাশে। রবিনের মনে হলো হাসছে তিমিটা, প্রথমদিন যেমন করে হেসেছিল, তেমনি।

কাছে এসে থামল রোভার। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ঠোঁট ছোঁয়াল বাক্সের গায়ে।

'ও-কে, গুড,' বাক্সটা পানি থেকে তুলল টিনহা। 'লক্ষ্মী রোভার, লক্ষ্মী ছেলে।' সন্তুষ্ট হয়েছে। একটা মাছ উপহার দিল

পানি থেকে লাফিয়ে উঠে শূন্যেই খপ করে মাছটা ধরল রোভার, ঝপাত করে পড়ল আবার পানিতে।

'এটাই দেখতে চেয়েছিলাম,' বাক্সের দিকে ইঙ্গিত করে বলল টিনহা। 'মনে হচ্ছে কাজ হবে। সাগরে ছাড়লে দূরে চলে গেলেও এর সাহায্যে ডেকে আনতে পারব। ওর ডাকই ওকে ফিরিয়ে আনবে।'

'আরেকটা ক্যাসেটে রি-রেকর্ড করে দিতে পারি,' কিশোর পরামর্শ দিল। 'এটাকে বার বার প্লে করে অন্য ক্যাসেটে রেকর্ড করতে থাকব, এখানে আছে দেড়-দুই মিনিট, আধ ঘণ্টা বানিয়ে ফেলতে পারব এটাকে।'

'মন্দ বুদ্ধি না,' বাক্সটা বাড়িয়ে দিল টিনহা। 'হাসপাতালে যাওয়া দরকার। চলো, তোমাদেরকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাই।'

র‍্যাঞ্চ হাউসের বাইরে পথের পাশে পার্ক করা আছে সাদা পিকআপ। আগের মতই এবারেও মুসা উঠল পেছনে, অন্য তিনজন সামনে।

খুব সতর্ক, দক্ষ ড্রাইভার টিনহা। কিন্তু এখন তার চালানো দেখে মনে হচ্ছে, কেমন যেন বেসামাল। মোড়ের কাছেও গতি কমাচ্ছে না, বেপরোয়া, গতির রেকর্ড ভঙ্গ করতে চলেছে যেন।

সামনে ডান দিকে তীক্ষ্ণ একটা মোড়। লাগামছাড়া পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে যাচ্ছে গাড়ি।

হ্যাণ্ডব্রেক টানল টিনহা। কিছুই হলো না। গতি কমল না গাড়ির। ইমারজেন্সী ব্রেকটা পুরো চাপল। কিন্তু স্পীডোমিটারের কাঁটা তোয়াক্কাই করল না, দ্রুত সরে যাচ্ছে ডানে, চল্লিশ...পঁয়তাল্লিশ...পঞ্চাশ।

'কি হয়েছে...,' কথা আটকে যাচ্ছে রবিনের। 'ব্রেকে গোলমাল?'

মাথা ঝাঁকাল টিনহা। 'কিছুতেই কাজ করাতে পারছি না।' গীয়ারের হাতল চেপে ধরে টান দিল, ইঞ্জিন নিচু গীয়ারে এনে গতি কমাতে চাইছে। থরথর করে কাঁপছে গাড়ি। মিটারের কাঁটা অস্থির।

# আট

পথের মাঝখানে গাড়ি নিয়ে এসেছে টিনহা। উল্টো দিক থেকে যদি কোন গাড়ি আসে এখন, মুখোমুখি সংঘর্ষে চুরমার হয়ে যাবে দুটোই।

সামনে গাড়ি দেখা গেল না। ভীষণ দৈত্য মনে হচ্ছে এখন সামনের মোড়ের পাথুরে পাহাড়ী দেয়ালটাকে।

ড্যাশবোর্ডে পা, আর সীটের পেছনে পিঠের চাপ দিয়ে শরীরটাকে কঠিন করে তুলেছে কিশোর আর রবিন। ধাক্কা প্রতিরোধের জন্যে তৈরি। কতখানি ঠেকাতে পারবে, আদৌ পারবে কিনা, জানে না।

শাঁই করে ডানে স্টিয়ারিং কাটল টিনহা, একই সঙ্গে রিভার্স করে দিল গীয়ার।

এখনও দেয়ালটা ছুটে আসছে মনে হচ্ছে।

চোখের পলকে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা, একটা স্ফুলিঙ্গ ছুটতে যতখানি সময় লাগে, ততটুকু সময়ের মধ্যে। হঠাৎ যেন এক পাশে সরে গেল দেয়াল, পরক্ষণেই পাশের জানালার কয়েক ইঞ্চি তফাতে চলে এল। গোঁ গোঁ চিৎকারে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে ইঞ্জিন। সীট খামচে ধরেছে কিশোর আর রবিন। কাজগুলো করছে অনেকটা অবচেতন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে। আসলে তাদেরকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে তাদের মগজ।

স্টিয়ারিং এখনও ডানেই চেপে রেখেছে টিনহা। ঘষা খেয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকারে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে টায়ার। জোর ঘষা লাগছে জানালার সঙ্গে দেয়ালের। খামচে টেনে জানালার চামড়া ছিঁড়ে রাখতে চাইছে রুক্ষ পাথরের দেয়াল।

স্টিয়ারিং সোজা করল টিনহা। দেয়ালের সঙ্গে একপাশের পুরো বডির ঘষা লাগছে এখন। চাকা জ্যাম হয়ে গেল। পিছলে আরও দশ গজ মত সামনে বাড়ল গাড়ি, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

পুরো এক মিনিট কেউ কোন কথা বলতে পারল না। স্টিয়ারিঙে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছে টিনহা, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।

'ও-কে,' মাথা তুলল টিনহা। কণ্ঠস্বর খসখসে, কিন্তু সামলে নিয়েছে অসাধারণ স্নায়ুর জোর। 'চলো, নামি। দেখি, ক্ষতি কতখানি হয়েছে। রবিন, তোমার ওদিক দিয়ে বেরোতে হবে, এদিকে দরজা আটকে গেছে।'

নামল তিনজনে। রবিনের গায়ের কাঁপুনি থামেনি। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল আরও কিছুক্ষণ। মনে পড়ল মুসার কথা।

ঝট করে সোজা হলো রবিন, তাড়াতাড়ি গিয়ে পেছনের টেইলগেট নামিয়ে উঁকি দিল। চেঁচিয়ে ডাকল, 'কিশোর, দেখে যাও।'

ছুটে এল কিশোর। দুজনে উঠে পড়ল ট্রাকের পেছনে।

হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মুসা। নিথর। তাড়াতাড়ি তার হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখল রবিন।

নড়েচড়ে উঠল মুসা। চোখ মেলল। ফিসফিস করে বলল, 'আল্লাহ্‌রে।...বেঁচে

আছি না মরে গেছি…'

'বেঁচেই আছ,' এত উত্তেজনার মাঝেও মুসার কথার ধরনে না হেসে পারল না রবিন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বন্ধুকে নিরাপদ দেখে। 'পালস ঠিক আছে, কথার ভঙ্গিও আগের মতই।'

'কে বলল আগের মত?' উঠে বসে হাত-পা ভেঙেছে কিনা টিপেটুপে দেখল মুসা। 'গলার ভেতরে কোলাব্যাঙ ঢুকেছে বুঝতে পারছ না?…কিন্তু হয়েছিল কি? ঠাটা পড়েছিল? নাকি দৌড়ের বাজি লাগিয়েছিল।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার মনে হয় ব্রেকের সংযোগ কেটে দিয়েছে কেউ।'

'ইচ্ছে করে?' উঠে দাঁড়াল মুসা।

'চলো, গিয়ে দেখি,' বলল রবিন।

কিশোরের অনুমান ঠিক, বোঝা গেল। ওরা ট্রাকের পেছন থেকে নেমে এসে দেখল, বনেট তুলে ভেতরে দেখছে টিনহা। ব্রেক প্যাডালের কানেকশন রডটা কাটা, হ্যাণ্ডব্রেকের সংযোগও বিচ্ছিন্ন। করাত দিয়ে নিখুঁতভাবে কাটা হয়েছে।

'উলফের বাড়ির বাইরে যখন ছিল, তখন কেটেছে,' কিশোর বলল। 'অনেকক্ষণ সময় পেয়েছে কাটার।'

'কে কাটল?' ভুরু কোঁচকাল টিনহা। 'কেন?'

কিশোরও জানে না এই প্রশ্নের জবাব। এ-নিয়ে ভাবতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়।

পরের দু-ঘণ্টায় অনেক কাজ করতে হলো। একটা টেলিফোন বুদে গিয়ে ওশন ওয়ারল্ডে ফোন করল টিনহা। ক্রেন নিয়ে এল তার দুই মেকসিকান বন্ধু। সাদা পিকআপটাকে টেনে নিয়ে চলল ওরা। তিন গোয়েন্দাকে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল ইয়ার্ডে।

সোজা এসে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল কিশোর। সুইভেল চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল। পুরোপুরি চালু করে দিল মগজ।

'কেউ,' শব্দ করে ভাবছে কিশোর, যাতে তার ভাবনায় সাহায্য করতে পারে রবিন আর মুসা, 'কেউ একজন চাইছে না, আমরা ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোটটা খুঁজে বের করি। আজ আমাদের খুন করতে চেয়েছিল সে-ই, কিংবা মারাত্মক আহত, টিনহাকে ঠেকাতে চেয়েছিল। ঠেকাতে চেয়েছিল আমাদের সবাইকেই, যাতে রোভারকে ট্রেনিং দিয়ে বোটটা খুঁজতে না পারি।' থামল সে, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল, তারপর বলল, 'তিনজন এখন আমাদের সন্দেহভাজন, চিনি, এমন তিনজন। এক,' এক আঙুল তুলল সে, 'বিংগো উলফ। কিন্তু বোটটা খুঁজে পেলেই তার লাভ বেশি। সে-ই তো সব করেছে, টিনহাকে ফোন করেছে, তিমিটাকে উদ্ধার করতে সাহায্য করেছে, তার বাড়িতে পুলে জায়গা দিয়েছে, ওটাকে ট্রেনিং দেয়াতে বাধ্য করেছে টিনহাকে। এ সবই প্রমাণ করে, আমাদের সাফল্য চায় সে।'

আবার থামল কিশোর। দুই আঙুল তুলল। 'দুই নম্বর, নীল বনেট। ওর সম্পর্কে কি জানি আমরা? বলতে গেলে কিছুই না। আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানে সে। আমাদের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার আগে থেকেই জানে আমাদের নাম, আমরা কে? কি করে জানল?'

কেউ জবাব দিল না।

'অনেক মিছে কথা বলেছে সে আমাদের সঙ্গে, টিনহার বাবা সেজেছে,' আবার বলে চলল কিশোর। 'তবে কিছু সত্যি কথাও বলেছে। বলেছে, ক্যাপটেন শ্যাটানোগার সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিল উলফ, সে-সময় ঝড়ে ক্যাপটেনের বোট ডুবেছে মেকসিকোতে যাওয়ার সময়, না না, দাঁড়াও,' হাত তুলল সে, 'ভুল বলেছি। বাজা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফেরার সময়।'

চুপ করে রইল দুই সহকারী।

নিথর হয়ে বসে রইল কিশোর কয়েক মুহূর্ত, তারপর হাত বাড়িয়ে টেনে নিল টেলিফোন। ডায়াল করল।

'হ্যালো,' স্পীকারে বেজে উঠল টিনহার কণ্ঠ।

'আমি কিশোর।'

'ও, কিশোর। ভাল আছো? উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।'

'না, উদ্বিগ্ন নই,' জবাব দিল কিশোর। 'বিস্মিত।'

'বিস্মিত! কেন?'

'কয়েকটা কথা জানা দরকার। হয়ত সাহায্য করতে পারবেন।'

'বলো।'

'ওশন ওয়ারল্ডে আপনাকে আমাদের একটা কার্ড দিয়েছিলাম মনে আছে? কাউকে দেখিয়েছেন?'

'না।'

'কার্ডটা কি করেছেন?'

'ডেস্কের ওপরই ফেলে রেখেছিলাম।'

'অন্য কেউ দেখে ফেলতে পারে?'

'পারে। আরও কয়েকজন ট্রেনার বসে ওঘরে। দারজার তালা প্রায় সব সময়েই খোলা থাকে। তোমরা সেদিন চলে যাওয়ার পর কার্ডটা রেখে তাড়াতাড়ি...'

'...চলে গিয়েছিলেন রোভারের কাছে, ও ভাল আছে কিনা দেখতে।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'মোড়ের কাছেই ছিলাম আমরা। আপনাকে পিকআপ নিয়ে যেতে দেখেছি।'

'অ। তোমাদের নাকের ডগা দিয়েই গেছি তাহলে,' থামল টিনহা। 'আর কিছু বলবে?'

'আপনার বাবার সম্পর্কে। উলফকে শেষ কবে নিয়ে গিয়েছিলেন আপনার বাবা যেবার তাঁর বোট ডুবেছে?'

দীর্ঘ নীরবতা। মনে করার চেষ্টা করছে বোধহয় টিনহা। 'বলতে পারব না। মাঝেমধ্যেই কাজে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন আর স্যান পেড্রোতে যাওয়া সম্ভব হয় না। সান্তা মনিকায় আমার এক বান্ধবীর ঘর শেয়ার করি। প্রতি সোমবারে বাবাকে দেখতে যেতাম স্যান পেড্রোতে। কিন্তু সেবার স্যান ডিয়েগোতে গিয়েছিলাম, বাড়ি যাইনি। দু-হপ্তা বাবার খোঁজ নিতে পারিনি, তারপর হাসপাতাল থেকে ফোন

এল…' কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল তার। মর্মান্তিক সেই মুহূর্তটা মনে পড়েছে হয়তো।

সহানুভূতি দেখিয়ে চুপ করে রইল কিশোর, টিনহাকে সামলে নেয়ার সময় দিল। 'কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছ বুঝতে পারছি। পুরো চোদ্দ-পনেরো দিনই হয়তো বাবা আর উলফ সাগরে ছিল, এবং সেটা জানার উপায় ছিল না, এই তো?'

'তাই নয় কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'ব্যাপারটা খুব জরুরী?'

জরুরী, জানাল কিশোর।

টিনহা লাইন কেটে দেয়ার পরও অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল গোয়েন্দাপ্রধান, গভীর ভাবনায় ডুবে রইল। সত্যিই কি বাজায় গিয়েছিল ক্যাপটেন আর উলফ? ফেরার পথেই ঝড়ে পড়েছিল? জানতে হবে।

কিন্তু কিভাবে? মুখ তুলে তাকাল মুসার দিকে। 'মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। যাবে?'

'নিশ্চই?' উঠে দাঁড়াল মুসা। 'যাব না মানে।'

'রবিন?'

'যাব,' বিখ্যাত চিত্রপরিচালককে সাহায্যের অনুরোধ করবে, বুঝতে পারছে রবিন, কিন্তু একটা কথা ভুলে যায়নি। তিনজন সন্দেহভাজনের মধ্যে দুজনের নাম উল্লেখ করেছে কিশোর, আরেকজন কে?

'কিশোর, এক সেকেণ্ড,' বলল রবিন। 'আরেকজন কাকে সন্দেহ করছ?'

দুই সুড়ঙ্গের পাল্লা তুলে ফেলেছে কিশোর, রবিনের কথার জবাব দিল না। অদৃশ্য হয়ে গেল সুড়ঙ্গের ভেতরে।

'হুঁ, বেশ জটিলই মনে হচ্ছে,' সব শুনে বললেন ডেভিস ক্রিস্টোফার। 'বসো, দেখি কিছু করা যায় কিনা।'

পর পর কয়েকটা ফোন করলেন তিনি বিভিন্ন জায়গায়। তারপর বেয়ারাকে ডেকে আইসক্রীম আনতে বললেন। বিশাল টেবিলে তার সামনে পড়ে থাকা খোলা ফাইলটা আবার টেনে নিতে নিতে বললেন, 'তোমরা খাও, আমি কাজটা সেরে নিই, খুব জরুরী। চিন্তা নেই, খবর এসে যাবে।'

ধীরে ধীরে খেলো ছেলেরা। কাজ করেই চলেছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। চুপচাপ বসে থেকে তাদের সময় আর কাটতে চাইছে না। কথাও বলতে পারছে না, চিত্রপরিচালকের কাজের অসুবিধে হবে। অস্বস্তিকর পরিবেশ। কিশোর প্রায় বলেই ফেলেছিল, আমরা এখন যাই, বাড়ি গিয়ে ফোন করে খবর জেনে নেব, ঠিক এই সময় বাজল ফোন।

রিসিভার তুলে নিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। নীরবে শুনতে লাগলেন ওপাশের কথা। শুনছেন, মাঝে মধ্যে হুঁ-হাঁ করছেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে ছেলেরা, মুসা কাত হয়ে গেছে একপাশে, যেন ওভাবে ঝুঁকে কান খাড়া করলেই রিসিভারের কথা শোনা যাবে।

অবশেষে রিসিভার নামিয়ে ছেলেদের দিকে তাকালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার,

'খবর কিছু পেয়েছি। কিন্তু তোমাদের কেসে এটা কি করে ফিট হবে বুঝতে পারছি না।'

'কি খবর, স্যার?' উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে এল কিশোর, আর ধৈর্য ধরতে পারছে না।'

'মেকসিকান ইমিগ্রেশন অথরিটির কাছে ফোন করেছিলাম। খোঁজ নিয়েছে ওরা। ফেব্রুয়ারির দশ তারিখে ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোটে উঠেছিল বিংগো উলফ। লা পাজে, বন্দরে ছিল দুদিন, বারোই ফেব্রুয়ারি রওনা হয়েছে।'

মাথা নোয়াল কিশোর, ভ্রূকুটি করল। 'থ্যাংক ইউ, স্যার,' বলল সে। 'ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোট ডুবেছে সতেরো তারিখে, নিঃসন্দেহ বাজা থেকে ফেরার পথে। স্যান পেড্রোতে ফিরছিল, এই সময় ঝড়ে পড়ে বোট।' মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল। 'আমার যা মনে হয়, মেকসিকো উপকূলের কাছেই কোথাও মাল চালান দেয়। তবে,' আবার চিত্রপরিচালকের দিকে ফিরল সে, 'সেবার বোধহয় কোন কারণে মাল নামাতে পারেনি। ওগুলো নিয়েই আবার ফেরত আসছিল। কিংবা মিছে কথা বলেছে উলফ, ক্যালকুলেটরগুলো আদৌ নেই জাহাজে। আপনার কি মনে হয়, স্যার?'

'বুঝতে পারছি না,' হাসলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'প্রথমেই তো বললাম, এবারের কেসটা বেশ জটিল।'

'আমার কাছেও পরিষ্কার হয়নি এখনও,' উঠল কিশোর। 'তো আমরা আজ যাই, স্যার।'

'এসো।'

দরজার দিকে চলল তিন গোয়েন্দা। পেছন থেকে চেয়ে আছেন চিত্রপরিচালক। মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে। বিড় বিড় করলেন, 'ছেলে একখান। ওর পেট থেকে কথা আদায় করা...' ফাইলটা টেনে নিলেন আবার।

# নয়

'কি বুঝলি, কিশোর?' মেরিচাচী বললেন। 'পারবি?'

ওয়ার্কশপের কোণে রাখা পুরানো ওয়াশিং মেশিনটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। আগের দিন কিনে এনেছেন ওটা রাশেদ চাচা। এককালে বোধহয় সাদা রঙ ছিল, এখন হলদে হয়ে গেছে, জায়গায় জায়গায় চলটা ওঠা। জায়গায় জায়গায় বাঁকাচোরা, টেপ খাওয়া। কিশোরের মনে হলো, দোমড়ানো কাগজ হাত দিয়ে চেপেচুপে আবার সোজা করা হয়েছে। মোটরটার অবস্থা কি হবে, আন্দাজ করা যাচ্ছে। বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি। সারা দিন লাগবে।'

চাচী হাসলেন। দুশ্চিন্তা অনেকটা দূর হলো। কিশোরের চেষ্টা করা মানেই তিনি ধরে নিলেন, হয়ে গেছে। নগদ পয়সা দিয়ে একটা জিনিস কিনে এনে বিক্রি হবে না, এ-দুঃখ কি সওয়া যায়? অন্তত মেরিচাচীর জন্যে এটা রীতিমত মনঃকষ্টের ব্যাপার।

'কর বাবা, কাজে লেগে যা, ঠিক করে ফেল,' খুশি হয়ে বললেন তিনি। 'তোকে আজ স্পেশাল লাঞ্চ খাওয়াব।'

'বেশি করে রেঁধো, চাচী। নইলে মুসা এসে শুনলে হার্টফেল করবে।'

হেসে চলে গেলেন চাচী।

এসব কাজে সারাদিন কেন সারা বছর ব্যয় করতেও কোন আপত্তি নেই কিশোরের, অকেজো যন্ত্রপাতি মেরামত করে আবার চালু করার মধ্যে দারুণ আনন্দ আছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জংধরা সমস্ত স্ক্রু খুলে মেশিনটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল কিশোর, মোটরটা আলগা করে ফেলল। বেজায় ভারি, ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর তুলতে বেশ কসরত করতে হলো। যতখানি আশঙ্কা করছিল, তত খারাপ অবস্থায় নেই। অনেক পুরানো মডেল, তিরিশ বছরের কম হবে না। তবে জিনিস বানাত বটে তখন, যত্ন করে ব্যবহার করলে একজনের সারা জীবন চলে যাবে একটাতেই। এখনকার মত এত কমার্শিয়াল ছিল না প্রস্তুতকারকরা।

একটা ড্রাইভিং বেল্ট দরকার, ভাবল কিশোর, বানিয়ে নিতে হবে। ওয়ার্কশপের জঞ্জালের স্তূপ খুঁজতে শুরু করল সে, শক্ত রবার দরকার। একই সঙ্গে ভাবনা চলছে, মেশিনটার কথা নয়, ভাবছে তাদের নতুন কেসের কথা। আগামীকাল সকালে টিনহার সঙ্গে দেখা করার কথা তিন গোয়েন্দার, সৈকতের এক জায়গায় একটা খাঁড়ির কাছে, টিনহার মেকসিকান বন্ধুদের সাহায্যে রোভারকে নিয়ে যাওয়া হবে ওখানে। তিন গোয়েন্দা আর রোভারকে নিয়ে ডুবন্ত বোটটা খুঁজতে যাবে টিনহা।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল কিশোর। ওয়ার্কবেঞ্চের ওপরে ঝোলানো লাল আলোটা জ্বলছে-নিভছে, তারমানে ফোন বাজছে হেডকোয়ার্টারে। এই বিশেষ ব্যবস্থাটা কিশোরই করেছে।

রবার খোঁজা বাদ দিয়ে এক টানে সরিয়ে ফেলল দুই সুড়ঙ্গের মুখের লোহার পাত। হামাগুড়ি দিয়ে আধ মিনিটেই পৌঁছে গেল অফিসে। ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার।

'হাল্লো,' হাঁপাচ্ছে, 'কিশোর পাশা।'

'হালো, কিশোর,' পরিচিত কণ্ঠস্বর, 'তিমিটার খোঁজ পেয়েছ?' খোঁজকে বলল খোঁ-ওজ।

'ফোন করছেন, ভালই হয়েছে, স্যার,' কিশোর বলল। 'অনেক এগিয়েছি আমরা। আশা করি, কাল সকাল সাতটা নাগাদ রোভারকে ছেড়ে দিতে পারব সাগরে!'

দীর্ঘ নীরবতা।

'হালো?' জোরে বলল কিশোর। 'হালো?'

'হালো, ভাল সংবাদ,' জবাব এল। 'খুব ভাল।'

'থ্যাংক ইউ।'

'ও হ্যাঁ, একশো ডলার পুরস্কার দেব বলেছিলাম।'

'হ্যাঁ, বলেছিলেন। নাম-ঠিকানা যদি দেন, বিল পাঠিয়ে দেব। তিমিটা যে সাগরে ছাড়ছি, তার একটা ফটোগ্রাফও দেব। কাজ করেছি, তার প্রমাণ।'

'আরে না না, তার দরকার নেই। তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট। আসলে, আগামী কিছু দিন শহরের বাইরে থাকব আমি, আজ বিকেলেই যদি দেখা করো, টাকাটা দিয়ে দিতে পারি। কারও পাওনা আটকে রাখা পছন্দ না আমার।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়,' বলল বটে, কিন্তু সন্দেহ জাগল কিশোরের, টাকা দেয়ার জন্যে এত আগ্রহ কেন? নাম ঠিকানাই বা জানাতে চায় না কেন? আর তিন গোয়েন্দাকেই বা এত বিশ্বাস কিসের, মুখের কথায়ই টাকা দিয়ে দেয়? 'কোথায় দেখা করব আপনার সঙ্গে, স্যার?'

'বারব্যাংক পার্ক চেনো?'

চেনে কিশোর। অনেক বছর আগে একটা জনপ্রিয় জায়গা ছিল। পার্কের মাঝখানে পুরানো একটা ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড আছে, এককালে নামকরা বাজিয়েরা বাজনা বাজাত সেই মঞ্চে উঠে, চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে লোকে শুনত। আস্তে আস্তে সরে চলে এল রকি বীচ শহর, এলাকা ছেড়ে চলে এল লোকে। পার্কটা এখনও আছে ওখানে কিন্তু কদর নেই, অযত্নে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে ঢেকে দিয়েছে ফুলের বাগান, পথ। আগাছা আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের জঙ্গল এখন ওখানে। রাতের বেলা আর ওদিক মাড়ায় না এখন কেউ।

'সন্ধ্যা আটটায় আসবে ওখানে,' বলল লোকটা। 'তোমার বন্ধুদের আনার দরকার নেই। তুমি একলা। ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের কাছে অপেক্ষা করব আমি।' ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড উচ্চারণ করল বেই-অ্যাণ্ড স্টেই-অ্যাণ্ড।

'স্যার...' আর কোন ভাল জায়গায় দেখা করা যায় কিনা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কিশোর, কিন্তু লাইন কেটে গেল।

রিসিভার রেখে দিয়ে ডেস্কের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল কিশোর। একা যেতে বলল কেন লোকটা? আর এমন বাজে একটা জায়গায় কেন? সন্দেহ গাঢ় হলো তার। আবার রিসিভার তুলে মুসা আর রবিনকে ফোন করল, জানাল সব। তারপর ফিরে এল ওয়ার্কশপে।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ মোটর ঠিক হয়ে গেল। নতুন স্ক্রু দিয়ে জায়গামত জুড়ে দিল সেটা। মেরিচাচীকে ডেকে এনে উদ্বোধন করল মেরামত করা যন্ত্রের। সকেটে প্লাগ ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'সুইচ টেপো, চাচী।'

গোঁ-ওঁওঁ করে স্টার্ট নিল মোটর, আস্তে আস্তে শব্দ বাড়তে লাগল, শেষে গর্জে উঠল ভীষণ ভাবে। এত জোরে কাঁপতে লাগল, মনে হচ্ছে ভূমিকম্পে কাঁপছে। যা-ই হোক, চালু তো হয়েছে, মেরিচাচী এতেই খুশি। তাঁর মতে 'এই ভয়ঙ্কর' জিনিস নেয়ার মত হাড়কিপটে লোকও পাওয়া যাবে এ শহরে।

'তুই সত্যি একটা ভাল ছেলে, কিশোর,' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন মেরিচাচী। 'তোর মত ছেলে আর একটাও নেই দুনিয়ায় (সব সময়ই মেরিচাচীর এই ধারণা, কিন্তু বলেন না। আজ এতই খুশি হয়েছেন, চেপে রাখতে পারলেন না আর)। কাজ অনেক হয়েছে। চল, হাতমুখ ধুয়ে খাবি।' হাত ধরে কিশোরকে নিয়ে চললেন

চাচী।

প্রায় ডিনারের সময় লাঞ্চ খেতে বসল কিশোর। ভরপেট খাওয়ার পর বেশ বড় সাইজের একটা আইসক্রীম শেষ করল। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে এল ইয়ার্ড থেকে।

পড়ন্ত আলোয় বেশ বড় জঙ্গল মনে হচ্ছে বারব্যাংক পার্ককে। কাছে এসে সাইকেল থেকে নামল কিশোর। পকেট থেকে সাদা চক বের করে পথের ওপর বড় একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আঁকল।

তিন গোয়েন্দার তিনজনেই পকেটে চক রাখে, একেকজন একেক রঙের। কিশোর রাখে সাদা, রবিন সবুজ, মুসা নীল। কোন কেসের তদন্তের সময় কেউ কোন বিপদে পড়লে অনেক কাজে লাগে এই চক আর আশ্চর্যবোধক চিহ্ন।

পার্কে ঢোকার পথের সন্ধান পাওয়া গেল। রাস্তা দেখা যাচ্ছে না, তবে দু-ধারে স্ট্রীট লাইট দেখে অনুমান করে নিল, পথটা কোথায় থাকতে পারে। কাছে এসে দেখল, দুপাশ থেকে এসে পথের প্রায় পুরোটাই ঢেকে দিয়েছে আগাছা আর লতা ঝোপ, মাঝখানের সরু একটুখানি শুধু বাকি। এগিয়ে চলল সে। খানিক পর পরই একটা করে আশ্চর্যবোধক এঁকে দিচ্ছে গাছের গায়ে, কিংবা ভাঙা কোন বেঞ্চিতে।

কল্পনা-বিলাসী নয় কিশোর। বাস্তবতার বাইরে কোন কিছুই বিশ্বাস করে না। ঝোপকে ঝোপই মনে করে, লুকানোর খুব ভাল জায়গা, বিষাক্ত সাপখোপ থাকতে পারে ভেতরে, তবে ভূত থাকে না।

কিন্তু হাজার হোক মানুষের মন, হোক না সেটা কিশোর পাশার। নির্জন জংলা পার্কের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে অকারণেই গা ছম ছম করে উঠল তার। মনে হলো, আশেপাশের সব কিছুই যেন জীবন্ত, নড়ছে, কথা বলছে ফিসফিস করে। গাছের বাঁকা ডালগুলো যেন কোন জীবের পঙ্গু হাত-পা। ছোট ছোট শাখাগুলো আঙুল, তাকে আঁকড়ে ধরে ছিনিয়ে যাওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে, ধরতে পারলেই টেনে নিয়ে গিয়ে ভরবে অন্ধকার জঠরে।

অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। সামনে মঞ্চটা দেখতে পেল কিশোর। ছাউনি ধসে পড়েছে, চারপাশে আগাছার জঙ্গল, আর কিছুদিন পর একেবারে ঢেকে যাবে। তখন মনে হবে ঘাসের একটা উঁচু ঢিপি।

মঞ্চের গায়ে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে ভাঙা একটা কাঠের বোর্ডে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আঁকল।

'কিশোর পাশা।'

এতই চমকে উঠল কিশোর, ঘুরতে গিয়ে হাতের ধাক্কায় আরেকটু হলেই ফেলে দিয়েছিল সাইকেলটা। চারপাশের বিষণ্ন অন্ধকারে লোকটাকে খুঁজল তার চোখ, কিন্তু দেখা গেল না।

'কে?' কোনমতে বলল।

খসখস শব্দ শোনা গেল। লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে। গজখানেকের মধ্যে আসার পর একটা মানুষের অবয়ব চোখে পড়ল কিশোরের।

খুব লম্বা, মাথায় হ্যাটের কিনারা নিচু হয়ে নেমে এসেছে কানের ওপর। চোখ দেখা যাচ্ছে না, চেহারাও বোঝা যাচ্ছে না, নাক মুখ কিছুই যেন নেই, লেপটানো।

অদ্ভুত।

লোকটা বিশালদেহী। গায়ে উইণ্ডব্রেকার, কাঁধ এত চওড়া, আর এত মোটা বাহু, কিশোরের মনে হলো একটা গরিলা, মানুষ নয়।

'এগোও, কিশোর,' বলল লোকটা। 'যা নিতে এসেছ নিয়ে যাও।' কথাবার্তাও জানি কেমন।

আগে বাড়ল কিশোর।

চোখের পলকে তার কাঁধ চেপে ধরে এক ঝটকায় তাকে লাটুর মত ঘুরিয়ে ফেলল লোকটা। ঘাড় চেপে ধরল। পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে লোকটার বাহু খামচে ধরে ছাড়ানোর চেষ্টা করল কিশোর। অদ্ভুত একটা অনুভূতি। নরম পাঁউরুটির ভেতরে দেবে গেল যেন তার আঙুল।

ছটফট শুরু করল কিশোর, ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাল। লোকটার আরেক হাত গলা চেপে ধরল তার। হাতের আঙুলগুলো হাড্ডিসর্বস্ব। অবাক কাণ্ড! এত মোটা লোকের এই আঙুল!

পুরো অসহায় হয়ে গেল গোয়েন্দাপ্রধান।

'যা করতে বলব, ঠিক তাই করবে,' বলল আগন্তুক।

মাথা নুইয়ে 'আচ্ছা' বলার চেষ্টা করল কিশোর, পারল না। হ্যামারলকে আটকে ফেলা হয়েছে তাকে।

'যদি না করো,' কানের কাছে গোঙাল লোকটা, 'যা বলব যদি না করো, ঘাড় মটকে দেব।' ঘাড় মটকের উচ্চারণ মনে হলো অনেকটা ঘাড়ম-টকে।

# দশ

যা যা করতে বলা হলো, ঠিক তাই করল কিশোর।

মঞ্চের কাছ থেকে হেঁটে চলল, যে পথে এসেছে, সেটা নয়, অন্য পথে। আরেকটা গাছের গায়ে আশ্চর্যবোধক আঁকার সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু পকেট থেকে চক বের করার সুযোগ নেই। অন্য কায়দায় ধরেছে এখন তাকে লোকটা, ডান হাত মুচড়ে নিয়ে এসেছে পিঠের ওপর, একেবারে শোল্ডার ব্লেডের কাছাকাছি। ব্যথা পাচ্ছে কিশোর।

পার্কের বাইরে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরানো ঝরঝরে লিমোসিন। কিশোরকে গাড়িটার কাছে নিয়ে এল লোকটা। হাত মুচড়ে ধরে রেখেই আরেক হাতে পকেট থেকে চাবি বের করে বুটের তালা খুলল।

'ঢোকো,' আদেশ দিল লোকটা।

পথের শেষ মাথার দিকে তাকাল কিশোর। কেউ নেই। সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে লাভ হবে না।

হাতে সামান্য ঢিল পড়ল। টান দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল কিশোর, লোকটাও অবশ্য ছেড়ে দিল। বিশাল, তুলতুলে নরম বুকের চাপ রেখেছে কিশোরের পিঠে, হাত মুক্ত হলেও পালাতে পারবে না কিশোর। পেট আর বুক দিয়ে ঠেলছে লোকটা,

তাকে বুটে ঢোকার জন্যে। আরেকটু হলেই ভারসাম্য হারিয়ে ভেতরে পড়বে কিশোর।

'আঁউ,' করে হাত-পা ছেড়ে দিল কিশোর, যেন সহসা জ্ঞান হারিয়েছে। পড়ে গেল পথের ওপর, মুখ গুঁজে রইল। পড়ার সময়ই চক বের করে ফেলেছে, ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছে গাড়ির তলায়। পথের ওপর একটা আশ্চর্যবোধক এঁকে ফেলল।

দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল লোকটা, ভাবছে কি করবে। ছেলেটা হঠাৎ এভাবে বেহুঁশ হয়ে পড়বে, আশা করেনি।

কিশোরের ঝাঁকড়া চুল ধরে টেনে তুলল সে, প্রায় ছুঁড়ে ফেলল বুটের মধ্যে। দড়াম করে নামিয়ে দিল ডালা।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

বুটের ভেতরে ঘন অন্ধকার, অপরিসর জায়গা, তার ওপর পোড়া মোটর অয়েল আর পেট্রলের তীব্র গন্ধ, পাক দিয়ে ওঠে নাড়ীভুঁড়ি। পোড়া গন্ধেই বোঝা যাচ্ছে, তেল খাওয়ার রাক্ষস গাড়িটা। গ্যালনে দশ মাইল যায় কিনা সন্দেহ। এ সমস্ত গাড়িতে আলাদা পেট্রল ক্যান রাখে লোকে।

অন্ধকারে হাতড়াতে শুরু করল কিশোর। একটু পরেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। কোমরের বেল্ট থেকে আট-ফলার প্রিয় ছুরিটা খুলে একটা বাঁকা ফলা দিয়ে খোঁচাতে লাগল ক্যানের গায়ে। ছোট একটা ছিদ্র করে ফেলল।

পুরানো গাড়ি, বুটের ভেতরটা আরও পুরানো। মেঝেতে মরচে, রঙ করার তাগিদ নেই মালিকের। কিশোরের জন্যে সহজই হয়ে গেল। ছুরির আরেকটা ফলা ব্যবহার করে মেঝেতেও আরেকটা গর্ত করে ফেলল সে।

ক্যানের ছিদ্রটা অনুমানে রাখল মেঝের গর্তের ওপর। অল্প অল্প করে তেল ঝরতে লাগল রাস্তার ওপর, ক্যানের মুখ দিয়ে ঢাললে হড়হড় করে অনেক বেশি পড়ে যেত, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত তেল, তাই ছিদ্র করে নিয়েছে। যাক, একটা চিহ্ন রেখে যেতে পারছে। রাস্তায় পড়ে শুকিয়ে যাবে, কিন্তু আবছা একটা চিহ্ন থেকে যাবেই।

আস্তে চলছে গাড়ি, জোরে চলার ক্ষমতাই নেই বোধহয় এঞ্জিনের। খুব বেশি দূর গেল না। ক্যানটা মাত্র অর্ধেক খালি হয়েছে। বেশ জোরেশোরে একটা দোল দিয়ে থেমে দাঁড়াল আদ্যিকালের লিমোসিন।

বুটের ডালা উঠল আবার। চুল খামচে ধরে টান দিল লোকটা। 'বেরোও।'

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল কিশোর। কেউ তার চুল টানুক, মোটেও পছন্দ করে না সে।

টলমল পায়ে খাড়া হলো কিশোর। যেন এই মাত্র হুঁশ ফিরেছে। ভাঙাচোরা একটা কাঠের বাড়ির ড্রাইভ-ওয়েতে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। চুল ছাড়েনি লোকটা, আবার যদি বেহুঁশ হয়ে যায় কিশোর, এই আশঙ্কায় বোধহয়। টেনে, ঠেলে-ধাক্কিয়ে তাকে নিয়ে এসে তোলা হলো বাড়ির বারান্দায়। ক্যাঁচকোঁচ করে আপত্তি জানাল জীর্ণ বারান্দা। কিশোরের ভয় হলো, ভেঙে না পড়ে।

চাবি বের করে দরজা খুলল লোকটা। 'ঢোকো।' চুল ধরে জোরে ঠেলে দিল কিশোরকে ঘরের ভেতর।

অন্ধকারে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হলো। সুইচ টেপার খুট শব্দ, আলো জ্বলল।

প্রথমেই লোকটার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। কেন তার চেহারা লেপটানো মনে হয়েছে বোঝা গেল। কাল একটা মোজা টেনে দিয়েছে মাথার ওপর দিয়ে। গোটা তিনেক ফুটো, দুটো চোখের কাছে, একটা নাকের কাছে।

আলোয় আরও বিশাল মনে হচ্ছে লোকটাকে। কিন্তু এত নরম কেন শরীর? চামড়ার নিচে খালি চর্বি, মাংস নেই?

ঘরের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর, কি আছে না আছে দেখে নিল। কয়েকটা কাঠের চেয়ার, একটা পুরানো টেবিল—ঠেলা দিলেই হয়তো বুড়ো মানুষের দাঁতের মত নড়ে উঠবে, তাতে একটা টেলিফোন, জানালায় মলিন পর্দা। নোংরা দেয়াল। লোকটা বোধহয় থাকে না এখানে।

'ওদিকে,' হাত তুলে আরেকটা দরজা দেখাল দৈত্য।

কিশোরকে ঠেলে দরজার কাছে নিয়ে এল সে, এক ধাক্কায় ভেতরে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিল পাল্লা। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল।

আবার অন্ধকারে এসে পড়েছে কিশোর। হাতড়ে হাতড়ে আবিষ্কার করল, ছোট্ট একটা ঘরে ঢোকানো হয়েছে তাকে, চিলেকোঠার চেয়ে ছোট।

'হাল্লো,' বাইরের ঘরে দৈত্যটার গলা শোনা গেল, টেলিফোনে কথা বলছে। 'মিস টিনহা শ্যাটানোগা আছে?'

দরজায় কান পেতে দাঁড়াল কিশোর।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর আবার শোনা গেল, 'মিস শ্যাটানোগা, আপনার বন্ধু কিশোর পাশা এখন আমার এখানে বন্দি।' বন্দিকে বলল 'বঅন্দি'।

নীরবতা।

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন , 'মিস, কিডন্যাপ করেছি আমি।'

কিডন্যাপকে বলল কিডনে-আপ।

আবার নীরবতা।

'না, টাকা চাই না। শর্ত একটাই, তিমিটাকে সাগরে ছেড়ে দিতে হবে, এখুনি। আর আপনার বাবার বোট খোঁজা চলবে না।'

দীর্ঘ নীরবতা।

'তাহলে আপনার কিশোর বন্ধুকে আর দেখবেন না, মানে জ্যান্ত দেখবেন না।'

রিসিভার রেখে দেয়ার শব্দ হলো।

রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে অনেক জটিল পরিস্থিতিতে পড়েছে তিন গোয়েন্দা। বিপদে পড়েছে। উদ্ধারও পেয়েছে কোন না কোনভাবে। এবারে কি ঘটবে জানে না কিশোর। তবে টিনহা দৈত্যটার কথা না শুনলে সে যে কিশোরকে খুন করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। মিথ্যে হুমকি দেয়নি লোকটা, কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেছে।

আলোচনার সময় সেদিন মুসা আর রবিনকে বলেছিল কিশোর, তিনটে লোককে সন্দেহ করে সে। দুজনের নাম বলেছে, আরেকজনের বলেনি। তৃতীয় লোকটা সেই রহস্যময় ব্যক্তি, যে ফোন করে তিমিটাকে ছেড়ে দিতে বলেছে, একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এই দৈত্যটাই সেই লোক।

লোকটা চায় না ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোট উদ্ধার হোক। সেজন্য দরকার হলে মানুষ খুন করতেও পিছপা হবে না। এক বার তো করেই ফেলেছিল প্রায়, টিনহার পিকআপের ব্রেক নষ্ট করে দিয়ে।

আট ফলার ছুরি খুলে নিল আবার কিশোর। তালা খোলার চেষ্টা করবে।

লোকটা দৈত্য, কিন্তু সেই তুলনায় স্বাস্থ্য ভাল না, পেশী বহুলনয়। হয়তো···হয়তো আচমকা ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া যাবে আশা করল কিশোর, তারপর দেবে ঝেড়ে দৌড়। কিন্তু আগে তালা খুলতে হবে।

ছুরির একটা সরু ফলা তালার ভেতরে ঢুকিয়ে নিঃশব্দে চাড় দিল কিশোর, খুঁচিয়ে চলল নীরবে।

বাইরের ঘরে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, মচমচ করছে কাঠের মেঝে। ফলে তালা খোলার চেষ্টায় অতি সামান্য শব্দ যা হচ্ছে, সেটা ঢেকে যাচ্ছে।

হঠাৎ, আর সাবধানতার প্রয়োজন দেখল না কিশোর। মড়াৎ করে ভাঙল কি যেন পাশের ঘরে। কাঠের কিছু ভেঙেছে। কি ব্যাপার? লোকটা মেঝে ভেঙে নিচে পড়ে গেল নাকি?

তালা খুলে গেল। হাতল ধরে হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ফেলল কিশোর। সে-ও ঢুকল বড় ঘরে, আর অমনি ঝটকা দিয়ে প্রায় ভেঙে খুলে ছিটকে পড়ল বাইরের দরজা।

অন্ধকার থেকে আলোয় এসে চোখ মিটমিট করছে কিশোর। আবছা দেখল, খোলা দরজা দিয়ে উড়ে এসে পড়ল একজন মানুষ।

ডাইভ দিয়ে মোটা লোকটার গায়ে এসে পড়ল মুসা, তাকে নিয়ে ধড়াম করে পড়ল কাঠের মেঝেতে। সারা বাড়িটাই যেন কেঁপে উঠল থরথর করে। মুসার পেছনে ছুটে ঢুকল রবিন।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আগেও অনেকবার পড়েছে, জানা আছে কি করতে হয়। এক সঙ্গে রইল না ওরা। তিনজন তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ে ছুটল। ধরা পড়লে একজন পড়বে। পেছনে প্রচণ্ড ক্যাঁচকোঁচ শুনে একবার ফিরে তাকাল কিশোর। নড়বড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে দৈত্যটা। এলোমেলো পদক্ষেপ। টলছে। পেটে মুসার আফ্রিকান খুলির জুতসই একখান গুঁতো খেয়েছে, সুস্থির হতে সময় লাগবে।

'ওই যে তোমার সাইকেল,' ছুটতে ছুটতেই হাত তুলে কিশোরের সাইকেল দেখাল রবিন। তার আর মুসারটাও রয়েছে ওখানেই।

টান দিয়ে যার যার সাইকেল তুলে নিয়ে লাফিয়ে চড়ে বসল ওরা। শাঁই শাঁই করে প্যাডাল ঘোরাল। দৈত্যটা আসছে কিনা দেখারও সময় নেই, প্রাণপণে ছুটে চলল অন্ধকার পথ ধরে।

# এগারো

'প্রথমে একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম,' বলল রবিন। 'তোমার সাইকেলটা দেখলাম মঞ্চের গায়ে ঠেকা দেয়া। চকের চিহ্ন দেখে ঢুকেছি, কিন্তু কোন পথে বেরিয়েছ, তার কোন চিহ্ন নেই।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'যাওয়ার আগে বুদ্ধি করে তোমাদের জানিয়ে ভালই করেছি, বেঁচে গেছি, নইলে যা বিপদে পড়েছিলাম।'

কথা হচ্ছে পরদিন সকালে। ছোট খাঁড়িটার কাছে এসে বসে আছে ওরা। পরনে সাঁতারের পোশাক।

আগের দিন রাতে বাড়ি ফিরেই টিনহাকে ফোন করেছে কিশোর, জানিয়েছে সে ভাল আছে। বোট খুঁজতে যাওয়ায় আর কোন অসুবিধে নেই।

'রবিন বুঝতে পেরেছে আগে,' কিশোরকে জানাল মুসা। 'পথে তেলের দাগ দেখতে পেলাম। কাছেই চকের দাগ। রবিন অনুমান করল, পুরানো একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল ওখানে, এঞ্জিন থেকে তেল ঝরে।'

'তা বুঝেছি,' রবিন বলল, 'কিন্তু একশো গজ দূরে আরেকটা তেলের দাগ আবিষ্কার করেছে মুসাই। ওটা না দেখলে তোমাকে খুঁজে পেতাম না। দাগ ধরে এগিয়ে গেলাম। দেখি, ভাঙা বাড়ির ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ঝরঝরে একটা লিমোসিন।'

শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল ওরা। একটা ট্রাক, কাঁচা রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসছে, এদিকেই। ট্রাকের পেছনে ফোম-রবারে আবৃত রোভার। ওর চোখ বন্ধ, ভাব দেখে মনে হচ্ছে বেশ আরামেই আছে।

সৈকতের সরু চিলতেটুকু পেরিয়ে পানির কিনারে নেমে গেল ট্রাক। পেছনের চাকার অ্যাকসেল এখন পানির নিচে। খাঁড়ির এই ধারটা বেছে নিয়েছে টিনহা, তার কারণ জায়গাটা খুব ঢালু। কিনার থেকে কয়েক গজ দূরেই পানি এত বেশি গভীর, সহজেই সাঁতরাতে পারবে রোভার।

ট্রাক থেকে নামল টিনহা আর তার মেকসিকান বন্ধু। টিনহার পরনে সাঁতারের পোশাক, গলায় ঝুলছে স্কুবা গগলস। ঘুরে ট্রাকের পেছনে চলে এল সে, পানিতে দাঁড়িয়ে আলতো চাপড় মেরে আদর করল রোভারকে।

মস্ত বড় ট্রাক, ক্রেনও আছে। হাত তুলে মুসাকে ডাকল টিনহা। কাছে গিয়ে দেখল মুসা, বেশ চওড়া একটা ক্যানভাসের বেল্ট আটকে দেয়া হয়েছে রোভারের শরীরের মাঝামাঝি এমন জায়গায়, যাতে ওটা ধরে ঝোলালে দুদিকের ভারসাম্য বজায় থাকে।

মুসাকে সাহায্য করতে বলল টিনহা।

মুসা আর মেকসিকান লোকটা মিলে ক্রেনের হুক ঢুকিয়ে দিল ক্যানভাসের বেল্টের মধ্যে, রোভারের পিঠের কাছে। এঞ্জিন চালু করে টান দিতেই শূন্যে উঠে গেল রোভার। তার মাথায় আরেকবার চাপড় দিয়ে ভয় পেতে নিষেধ করল টিনহা।

সামান্যতম উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না তিমিটাকে। চোখ মেলে দেখছে লেজ নাড়ছে। কিশোর আর রবিনও এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে। তিন কিশোর মিলে ঠেলে ঝুলন্ত তিমিটাকে নিয়ে গেল বেশি পানির ওপর। চেঁচিয়ে নামানোর নির্দেশ দিল টিনহা ক্রেন ড্রাইভারকে।

আস্তে করে পানিতে নামিয়ে দেয়া হলো রোভারকে। বেল্ট খুলে দিল মুসা। সাঁতরাতে শুরু করল তিমি, আবার নিজের জগতে, স্বাধীন খোলা দুনিয়ায় ফিরে এসেছে। এক ছুটে চলে গেল কয়েক গজ দূরে।

'রোভার, রোভার, দাঁড়াও,' ডাকল টিনহা।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল রোভার। শরীর বাঁকিয়ে ঘুরে গেল মুহূর্তে, ছুটে এল, কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে থাকা টিনহার গায়ে মুখ ঘষল। মাথায় চাপড় মেরে ওকে আদর করল টিনহা।

'ও-কে,' মেকসিকান বন্ধুকে বলল টিনহা, 'মুচাস গ্রেশাস।'

হেসে গিয়ে ট্রাকে উঠল মেকসিকান। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'বুয়েনা সুয়েরটি,' স্টার্ট দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল সে।

'রেডি?' তিন গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করল টিনহা। সাগরের দিকে চেয়ে দেখল, একশো গজ দূরে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে উলফের কেবিন ক্রুজার। 'কিশোর, টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে নাও। রোভার আমার কাছছাড়া হবে না, জানি, তবু যন্ত্রটা সঙ্গে থাকা ভাল। বলা তো যায় না।'

'আমি বলি কি,' পানিতে টিনহার পাশে চলে এল কিশোর।

'কি?'

ভেবে দেখলাম, রেকর্ডারটা নিয়ে রবিনের এখানে থাকা উচিত।'

'কেন?'

কেন, সেটা বলল কিশোর। 'উলফকে বিশ্বাস কি? একাই হয়তো মেকসিকো উপকূলে গিয়ে ক্যালকুলেটরের চালান দিয়ে আসতে পারবে, ক্যাপটেন শ্যাটানোগার দরকার পড়বে না। সেক্ষেত্রে আপনার শেয়ার মারা যেতে পারে। রবিন থাকুক এখানে।'

'তাতে কি লাভ?'

খুলে বলল কিশোর।

মন দিয়ে শুনল টিনহা। তারপর বলল, 'তারিখের ব্যাপারে তুমি শিওর?'

'শিওর। মেকসিকান ইমিগ্রেশন অফিসে খোঁজ নিয়েছি। লাপাজ থেকেই বোট ছেড়েছিল।'

চুপচাপ ভাবল কিছুক্ষণ টিনহা। 'ওকে,' গগলসটা পরে নিল চোখে। 'রবিনকে ছাড়াই পারব আমরা। রোভার, এসো যাই।'

দ্রুত সাঁতরে চলল টিনহা। পাশে রোভার। পেছনে কিশোর, টিনহা আর তিমিটার সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

সৈকতে এসে উঠল মুসা। একটা প্লাসটিকের ব্যাগে করে ছোট একটা ওয়াকি-টকি নিয়ে এসেছে কিশোর, খাঁড়ির কাছে ফেলে রেখে গেছে, ওটা ঝুলিয়ে নিল

কোমরে।

'এটা নিয়ে সাঁতরাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'পারব,' বলল মুসা। 'যথেষ্ট ভারি, কিন্তু পানিতে নামলে ভার কমে যাবে।'

মুসাকে নেমে যেতে দেখল রবিন। গলা পানিতে নেমে সাঁতরাতে শুরু করেছে। পানি নিরোধক ব্যাগে রয়েছে ওয়াকি টকি, পানি ঢুকবে না। ভেতরে বাতাস রয়ে গেছে, ভেসে উঠেছে ব্যাগটা। সাঁতরাতে অসুবিধে হচ্ছে না মুসার, অল্পক্ষণেই ধরে ফেলল কিশোরকে।

পানির কিনার থেকে উঠে এল রবিন। আগের বাক্সটাতেই রয়েছে টেপরেকর্ডার, ওটা তুলে নিয়ে চলে এল তার সাইকেলের কাছে। পেছনের ক্যারিয়ারে পুঁটুলি করে রেখেছে তার সোয়েটার, ওটার ভেতর থেকে বের করল আরেকটা ওয়াকিটকি। অ্যানটেনা তুলে দিয়ে সুইচ টিপে অন করল যন্ত্রটা। শব্দ গ্রহণের জন্যে তৈরি।

শুকনো একটা জুতসই পাথর খুঁজে নিল রবিন, সোয়েটারটা তার ওপর বিছিয়ে আরাম করে বসল, ওয়াকি টকিটা রাখল কোলে। পাশে রাখল রেকর্ডারের বাক্স। উলফের বোটের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে টিনহা আর রোভার, দেখা যাচ্ছে।

স্বাগত জানাল উলফ। টিনহাকে টেনে তোলার জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

চাইলও না টিনহা। 'রোভার, থাকো এখানে,' বলে কাঠের নিচু রেলিঙ ধরে এক ঝটকায় উঠে পড়ল, স্বচ্ছন্দে।

টিনহার মত এত সহজে উঠতে পারল না কিশোর, বেগ পেতে হলো। পেছনে কয়েক গজ দূরে চুপ করে ভেসে রয়েছে মুসা।

'যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা করব, মিস্টার উলফ?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো,' কিশোরকে ককপিটে নিয়ে এল উলফ। ছোট্ট ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরাটা দেখাল।

পরীক্ষা করে দেখল ওটা কিশোর, হুইলের ওপরে বাল্‌ক্‌ হেডের সঙ্গে আটকানো মনিটর স্ক্রীনটাও দেখল।

'পানির নিচে কাজ করবে ক্যামেরাটা? শিওর?' জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়। ওশন ওয়ারল্ড থেকে ধার নিয়েছে টিনহা। ওখানে প্রায় সারাক্ষণই কাজ চলে এটা দিয়ে,' সারাক্ষণকে উচ্চারণ করল সারা-কখ্‌খণ। 'আর কোন প্রশ্ন আছে?'

আরও অনেক প্রশ্ন তৈরি করে ফেলেছে কিশোর, করেই যাবে একের পর এক, যতক্ষণ না মুসা কাজ সারে। জাহাজে উঠে কোমর থেকে প্লাসটিকের ব্যাগ খুলে জাহাজের পেছনের অংশে লুকাতে হবে, উলফকে না দেখিয়ে।

কিশোর ভাল অভিনেতা, তবে বোকার ভান করার মত এত ভাল কোন অভিনয় করতে পারে না। বোকা বোকা ভাব দেখিয়ে বলল, 'আমি ভাবছি, পানির নিচ থেকে রেঞ্জ কতখানি দেবে? বোটের কত কাছে থাকা লাগবে রোভারের?'

'পঞ্চাশ গজ দূরে থাকলেও স্পষ্ট ছবি আসবে,' চকচক করে বিরক্ত প্রকাশ

করছে যেন উলফের টাক। 'টিনহা তোমাকে এসব বলেনি?'

'হ্যাঁ, মনে হয় বলেছে। কিন্তু রোভারের মাথায় সার্চলাইট বেঁধে...' আর বলার দরকার নেই, থেমে গেল কিশোর। মুসা এসে দাঁড়িয়েছে পেছনের ডেকে। কিশোরের চোখে চোখ পড়তেই ভেজা চুলে আঙুল চালাল—সংকেত ঃ নিরাপদে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ব্যাগটা।

'ও, হ্যাঁ, খুব শক্তিশালী লাইট তো, হবে মনে হয়,' আগের কথাটা শেষ করল কিশোর, হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছে সব কিছু।

'চলো তাহলে, কাজ সারা যাক।' ডেকে বেরিয়ে এল উলফ।

রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রোভারের সঙ্গে কথা বলেছে টিনহা, তাকে বলল উলফ, 'আরেকটা ছেলে কোথায়? তিনজন ছিল না?'

'ঠাণ্ডা লেগেছে,' পেছন থেকে চট করে জবাব দিল মুসা। 'খাঁড়ির কাছে বসিয়ে রেখে এসেছি। ভাবলাম...'

'থাকুক,' আউটবোর্ড মোটরের থ্রটলে গিয়ে হাত রেখে টিনহার দিকে ফিরল উলফ, 'কত জোরে সাঁতরাতে পারবে মাছটা?'

'ও মাছ নয়,' রেগে উঠল টিনহা। 'অত্যন্ত ভদ্র, সভ্য, বুদ্ধিমান, স্তন্যপায়ী প্রাণী।...হ্যাঁ, চাইলে ঘণ্টায় পনেরো মাইল বেগে ছুটতে পারবে। কিন্তু আপনি বেশি জোরে চালাবেন না বোট। আট নটের নিচে রাখবেন। নইলে ও তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে যাবে।'

'জো হুকুম,' থ্রটল ঠেলে দিয়ে হুইল ধরল উলফ। খোলা সাগরের দিকে বোটের নাক ঘোরাল।

টিনহা আগের জায়গায়ই রইল। খেলতে খেলতে বোটের সঙ্গে এগোচ্ছে রোভার, ওটার সঙ্গে কথা বলছে। তিমিটা কখনও শাঁ করে ছুটে যাচ্ছে দূরে, পরক্ষণেই ডাইভ দিয়ে চলে আসছে আবার, ভুস্‌স করে মাথা তুলছে বোটের পাশে।

জরুরী একটা কথা জানার জন্যে উসখুস করছে কিশোর, কিন্তু সে বোকা সেজে রয়েছে, তার জিজ্ঞেস করাটা উচিত হবে না। আপাতত বোকা থাকারই ইচ্ছে। মুসার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল সে-কথা, কি জিজ্ঞেস করতে হবে শিখিয়ে দিল।

উলফের কাছে গিয়ে বলল মুসা, 'তীর থেকে কতদূরে পাওয়া গিয়েছিল আপনাদেরকে?'

'মাইল পাঁচেক,' সামনে সাগরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল উলফ। 'কোস্টগার্ডরা তাই বলেছে।'

মুসার দিকে চেয়ে নীরবে ঠোঁট নাড়ল কিশোর।

বুঝল মুসা। উলফকে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণ ছিলেন পানিতে?'

'এই ঘণ্টা দুয়েক।'

আবার ঠোঁট নাড়ল কিশোর।

মুসা বলল, 'জোয়ার ছিল, না ভাটা?'

'অন্ধকার হয়ে এসেছিল,' মনে করার চেষ্টা চালাচ্ছে উলফ। 'আর যা বড় বড় ঢেউ, ভালমত কিছু দেখারই উপায় ছিল না। তবে ঢেউয়ের মাথায় যখন উঠে যাচ্ছিলাম, তখন তীর চোখে পড়ছিল। চেষ্টা করেও তীরের কাছে যেতে পারছিলাম না। বোধহয় ভাটাই ছিল তখন।'

মনে মনে দ্রুত হিসেব শুরু করল কিশোর। ঝড়ের সময় উত্তর-পশ্চিম থেকে বইছিল হাওয়া, তীর বরাবর ঠেলে নেয়ার কথা দুজনকে। লাইফ-জ্যাকেট পরা ছিল, ওই অবস্থায় হাত পা নড়ানোই মুশকিল, নিশ্চয় সাঁতরে বিশেষ এগোতে পারেনি। তাছাড়া ঢেউয়ের জন্যে এগোচ্ছে না পিছাচ্ছে সেটাও ভাল মত দেখার উপায় ছিল না। বলছে, দু-ঘণ্টা ছিল পানিতে, ভাটা হলে ওই সময়ে অন্তত দু-মাইল সরে গেছে সাগরের দিকে। কোস্ট গার্ডরা পেয়েছে ওদেরকে পাঁচ মাইল দূরে, তারমানে তীর থেকে তিন মাইল দূরে ডুবেছে বোট।

মুসাকে চোখের ইশারায় কাছে ডাকল কিশোর। ফিসফিস করে জানাল।

ডেকে কয়েক মুহূর্ত পায়চারি করল মুসা, হিসেব করার ভান করল, তারপর আবার উলফের কাছে গিয়ে বলল, 'তীর থেকে মাইল তিনেক দূরে ডুবেছিল বোট, না?'

'জানলে কি করে?' মুসার দিকে তাকাল উলফ।

'আপনার কথা থেকে।'

'হুঁ, আমারও তাই ধারণা,' ঘড়ির দিকে চেয়ে কি হিসেব করল উলফ। এঞ্জিন নিউট্রাল করে নিল, মিনিটখানেক আপন গতিতে চলল বোট। 'এসে গেছি,' টিনহার দিকে ফিরে বলল সে। 'মাছটাকে লাগাম···' টিনহাকে কড়া চোখে চাইতে দেখে থেমে গেল। 'না, মানে স্তন্যপায়ী জীবটাকে পাঠানো যায় এবার। আমরা পৌঁছে গেছি।'

এক জায়গায় ভাসছে এখন বোট, মৃদু ঢেউয়ে দুলছে।

'রোভার, কাছে এসো, রোভার,' টিনহা ডাকল। ডেকে ফেলে রেখেছে ক্যানভাসের কলারটা, টেলিভিশন-ক্যামেরা আর সার্চলাইট ওতে বেঁধে রেখেছে আগেই। ওগুলো তুলে নিয়ে পানিতে নামল সে। তিমির মাথা গলিয়ে পরিয়ে দেবে ক্যানভাসের কলার, সামনের দুই পাখনার ঠিক পেছনে রেখে শক্ত করে বাকলেস আটকে দিলে হাজার ঝাঁকুনিতেও আর খুলে আসবে না।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। তিন মাইল দূরে ডুবেছে বোট, কিন্তু কোন জায়গা থেকে তিন মাইল? উলফের স্পষ্ট ধারণা নেই। এখানে দু-পাশের দশ মাইলের মধ্যে যে কোন জায়গায় ডুবে থাকতে পারে। এতবড় এলাকায় ছোট্ট একটা বোট খোঁজা খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার সামিল, সেটা তিমিকে দিয়ে খোঁজালেও।

কলার পরিয়ে ডেকে ফিরে এল টিনহা। তার পাশে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনার বাবা আর কিছু বলতে পেরেছেন? ঝড়ের সময়কার কথা?'

মাথা নাড়ল টিনহা। 'নাহ্ আর কিছু না। যা বলেছে, বলেছি তোমাকে।'

কি বলেছে, মনে আছে কিশোরের। দুটো পোলের ওপর নজর রাখতে বলেছে। কিছু একটা নিশ্চয় বোঝাতে চেয়েছে। কি?

তিন মাইল দূরের তীরের দিকে তাকাল কিশোর।

তেমন কিছুই দেখার নেই। পাহাড়ের উঁচু উঁচু চূড়া, ওপাশে কি আছে কিছুই চোখে পড়ছে না, শুধু আরও উঁচু পর্বতের চূড়া ছাড়া। পাহাড়ের ওপর মাঝেমধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একআধটা নিঃসঙ্গ বাড়িঘর। টেলিভিশনের একটা রিলে টাওয়ার আছে, আরেক পাহাড়ের মাথায় একটা ফ্যাকটরি, অনেক উঁচু চিমনি।

'ওয়েট স্যুট পরে নাও, মুসা,' কানে এল টিনহার কথা। 'এয়ার ট্যাংকগুলো চেক করে নেয়া দরকার।'

পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়েই রয়েছে কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটার সময় এত জোরে টান মারছে, প্রায় থুঁতনির কাছে চলে আসছে ঠোঁট।

ক্যাপটেন শ্যাটানোগা অভিজ্ঞ নাবিক, ভাবছে কিশোর। বোট ডুবে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নিশ্চয় কোন না কোন নিশানা রেখেছে। যদি খালি ভালমত কথা বলতে পারত...

টেলিভিশন টাওয়ার আর ফ্যাকটরির চিমনির ওপর দ্রুত বার দুই আসা যাওয়া করল কিশোরের দৃষ্টি। হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা।

'দুই পোল!'

প্রায় ছুটে এসে উলফের বাহু খামচে ধরল কিশোর। বোকা সেজে থাকার সময় এখন নয়। চেঁচিয়ে বলল, 'ওই পোল দুটো এক লাইনে আনুন।'

'কি? বোকার মত কি ড্যাড়ড্যাড় করছ?'

'বোট ডুবে যাওয়ার সময় লক্ষ রেখেছিলেন ক্যাপটেন শ্যাটানোগা। চিহ্ন রেখেছিলেন। ওই যে টেলিভিশন টাওয়ার, আর ওই যে চিমনি।'

'কী।'

'দেখতে পাচ্ছেন না?' কিশোরের মনে হলো এখন উলফই বোকার অভিনয় করছে। 'বোটটা পেতে চান? জাহাজ সরিয়ে নিন। ওই পোল দুটোর দিকে লক্ষ রেখে পিছান, এদিক ওদিক সরান, যতক্ষণ না জাহাজের সঙ্গে এক লাইনে আসে ও দুটো।'

# বারো

বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে সামনের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। তিন মাইল দূরে তীরের দিকে নজর। জাহাজটা নড়ছে, টাওয়ার দুটোও সরছে। আরও একশো গজ—হিসেব করল সে, তারপরই এক লাইনে এসে যাবে দুটো।

হুইল ধরে রয়েছে উলফ।

'গতি কমান,' নির্দেশ দিল কিশোর। 'হ্যাঁ, এই গতি স্থির রাখুন।'

একে অন্যের দিকে সরছে টাওয়ার দুটো। সরছে...সরছে...হ্যাঁ মিশে গেছে। চিমনিটার ঠিক সামনাসামনি হয়েছে টেলিভিশন টাওয়ার। জাহাজের সঙ্গে এক লাইন।

'রাখুন,' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'রাখুন এখানেই, নড়াবেন না।' চোখ থেকে

কইনোকুলার সরাল সে।

পানি খুব গভীর, নোঙ্গর ফেলা গেল না। এঞ্জিন চালু রেখে স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এক জায়গায় রাখতে হবে জাহাজটাকে, হুইল ধরে রাখতে হবে সারাক্ষণ।

তীরের দিকে জাহাজের নাক ঘোরাল উলফ। চকচকে টাকটা কয়েক মিনিট আগে ভোঁতা ভোঁতা লাগছিল, এখন মনে হলো কিশোরের, বেশ জ্বলজ্বল করছে। মুখের ভাব টাকের চামড়ায় প্রকাশ প্রায় নাকি? ফিরে গিয়ে এ-ব্যাপারে পড়াশোনা করতে হবে, ঠিক করল সে। আর যা-ই হোক, সারেঙ হিসেবে উলফের জুড়ি কম, স্বীকার করতেই হলো তাকে। সেটা নিশ্চয় টাকের জন্যে নয়।

'ও-কে, মুসা, হয়েছে,' মুসার পিঠে এয়ার ট্যাংক বেঁধে দিয়ে বলল টিনহা।

মাস্ক পরে নিল মুসা, ব্রীদিং হোস আর এয়ার-প্রেশার গজ চেক করে দিল টিনহা। বাতাসের ট্যাংক 'ফুল' শো করছে গজের কাঁটা।

পায়ে ফ্লিপার, বিচিত্র একটা জন্তুর মত থপাস থপাস করে ডেক দিয়ে হেঁটে গেল মুসা টিনহার পেছনে। রেলিঙে উঠে বসল টিনহা, সাগরের দিকে পেছন করে, রেলিঙ ধরে আস্তে করে উল্টে গিয়ে আলগোছে ছেড়ে দিল হাত, ঝপাং করে পড়ল পানিতে।

মুসা পড়ল টিনহার পর পর।

কয়েক ফুট নেমে গিয়ে ডিগবাজি খেয়ে শরীর সোজা করল মুসা, মাথা নিচু করে ভেসে রইল। মনে করার চেষ্টা করল ওস্তাদ কি কি শিখিয়েছেন। কি করতে হবে এখন।

মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবে, তাতে তোমার মাস্ক ধোঁয়াটে হবে না, পরিষ্কার দেখতে পাবে। এয়ার হোস চেক করা, হোসে গিঁটটিট লেগেছে কিনা, বাতাস রুদ্ধ হয়েছে কিনা শিওর হয়ে নাও। তোমার সুইম স্যুটের ভেতরটা নিশ্চয় ভেজা-ভেজা লাগছে, অপেক্ষা করো, সাগরের পানি আর তোমার দেহের তাপমাত্রা এক হয়ে নিক। এবার নামতে শুরু করো, মনে রাখবে, যত নিচে নামবে পানির তাপ ততই কমবে, চাপ বাড়বে। মাথা গুলিয়ে উঠছে টের পেলেই আর নামবে না, সঙ্গে সঙ্গে উঠতে শুরু করবে, তবে আস্তে আস্তে, তাড়াহুড়ো করবে না।

তিন ফুট পানির নিচে অলস ভঙ্গিতে কয়েক মিনিট সাঁতরে বেড়াল মুসা, শরীরকে ঢিল হওয়ার সময় দিল, সইয়ে নিল এখানকার পানির সঙ্গে।

ডাইভিং খুব পছন্দ মুসার। দারুণ একটা অনুভূতি। মনে হচ্ছে, বাতাসে ভাসছে সে, পাখি যেভাবে ভাসে। আশ্চর্য এক স্বাধীনতাবোধ। দেখতে পাচ্ছে, কয়েক গজ দূরে তারই মত ভেসে রয়েছে টিনহা আর রোভার। হাত তুলে ইঙ্গিত করল মুসা, বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাথা লাগিয়ে গোল করে দেখাল, তারমানে ডাইভ দেয়ার জন্যে তৈরি।

রোভারের পিঠ চাপড়াল টিনহা। নিচের দিকে মুখ করে ডাইভ দিল রোভার, তার আগে আগে পানি ফুঁড়ে নেমে যাচ্ছে শক্তিশালী সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। নামছে···নামছে···নামছে···ওকে অনুসরণ করতে বেগ পেতে হচ্ছে মুসার, এমনকি টিনহারও।

ককপিটে বসে দেখছে কিশোর, টেলিভিশন মনিটরের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ। হুইলে হাত রেখে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে রয়েছে উলফও।

দেখতে দেখতে মনে হলো কিশোরের, পানির তলার দৃশ্য নয়, মহাকাশের বিচিত্র দৃশ্য দেখছে। তীব্র সাদা গোল একটা আলোর চক্র যেন মহাকাশের কালো অন্ধকারে ফুটে উঠেছে, তার মাঝে ফুটছে নানা রকম রঙ, আকৃতি। একবার মনে হলো, মেঘলা আকাশ দেখছে, তারপর এলোমেলো হয়ে ঝাপসা হয়ে গেল মেঘ, সরে গেল, লাফ দিয়ে এসে যেন সে জায়গা দখল করল এক ঝাঁক রঙিন মাছ। সরে গেল ওগুলোও।

রোভার বোট থেকে পাশে বেশি সরলে আবছা হয়ে আসে ছবি, তাড়াতাড়ি সেটুকু দূরত্ব আবার পূরণ করে নেয় উলফ বোট সরিয়ে নিয়ে। চিমনি আর টাওয়ারের সঙ্গে অদৃশ্য লাইন একটু এদিক ওদিক হলেই ঘটছে এটা। ছবি আর আলো আবার স্পষ্ট হলেই জাহাজ স্থির করে ফেলছে সে. দক্ষ হাত, সন্দেহ নেই। কাজটা যথেষ্ট কঠিন।

রোভারের অনেক ওপরে থাকতেই থেমে গেল মুসা। আর নামার সাহস হলো না। তার জানা আছে, মানুষের দেহের ওপর পানির চাপ অসহ্য হয়ে উঠলে এক ধরনের অদ্ভুত অনুভূতি জাগে, অনেকটা মাতলামির মত, তাল পায় না যেন শরীর। অতি-আত্মবিশ্বাসী হয়ে তখন উল্টোপাল্টা অনেক কিছু করে বসতে পারে সাঁতারু, নিজের জীবন বিপন্ন করে তোলে নিজের অজান্তেই।

সেই পর্যায়ে যেতে চাইল না মুসা। অনেক নিচে রোভারের সার্চলাইটের আলো দেখতে পাচ্ছে। রোভারের ক্ষমতায় ঈর্ষা হলো তার। আফসোস করল, আহা তিমির মতই যদি মানুষের শরীরের গঠন হত, গভীর পানিতে সহজে নামতে পারত। তিমি ডাইভ দিয়ে এক মাইল গভীরেও নেমে যেতে পারে, ঘণ্টাখানেক সহজেই কাটিয়ে দিয়ে আসতে পারে ওই ভয়ঙ্কর গভীরতায় অকল্পনীয় পানির চাপের মধ্যে।

ব্রীদিং টিউবটা সোজা করার চেষ্টা করল মুসা। বাঁকা পাইপটার পুরোটায় আঙুল বোলাল, একেবারে এয়ার ট্যাংকের গোড়া পর্যন্ত।

অদ্ভুত তো! ভাবল সে। পাইপে কোনরকম গিঁট নেই, জট নেই, তার পরেও···

উদ্বিগ্ন হয়ে আবার হাত বোলাল পাইপে, কোথাও একটা জট আছেই আছে, থাকতেই হবে, নইলে বাতাস পাচ্ছে না কেন ফুসফুস? শ্বাস নিতে পারছে না।

কোমরের ওয়েট বেল্টের বাকলসে হাত দিল সে। শান্ত থাকার চেষ্টা করছে। নিজেকে বোঝাল, দম বন্ধ রাখো। ভারি বেল্টটা খুলে ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে যাও ওপরে। আতঙ্কিত হয়ো না, গর্দভ কোথাকার! খোলো, খুলে ফেলো বেল্ট।

কিন্তু কথা শুনছে না আঙুল, অসাড় হয়ে গেছে। চোখেও কি গোলমাল হয়েছে। নইলে চারপাশের পানির রঙ বদলে যাচ্ছে কেন? হালকা গোলাপী থেকে লাল···তারপর গাঢ় লাল···গাঢ় হতে হতে এমন অবস্থা হলো, কালো মনে হচ্ছে

লনকে…

বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে সে। লাথি দিয়ে পা থেকে খুলে ফেলতে চাইছে ফ্লিপার। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ঠেলে উঠতে চাইছে ওপরে…

উজ্জ্বল আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখের সামনে। বুকে চাপ দিতে শুরু করেছে ভারি শক্ত কিছু। বুলডোজারের মত শক্তিশালী কিছু একটা ঠেলে তুলছে যেন তাকে ওপরে।

বাধা দিল না মুসা, দেয়ার সামর্থ্যও নেই। শরীরের শেষ শক্তি বিন্দু দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইল ভারি জিনিসটাকে।

পানির ওপরে ভেসে উঠল মুসার মাথা। পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে একটানে তার মাস্ক খুলে নিল কেউ। হাঁ করে দম নিল সে, ফুসফুস পূর্ণ করে টানল বিশুদ্ধ বাতাস।

ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে সরে গেল লাল অন্ধকার। নিচে তাকিয়ে আবছা একটা ঝিলিমিলি দেখতে পেল। ছবিটা স্পষ্ট হতে সময় নিল।

ক্যানভাসের কলারটা চিনতে পারল সে। একটা সার্চলাইট। একটা ক্যামেরা।

রোভারের পিঠে শুয়ে আছে মুসা।

পাশে ভাসছে টিনহা। সে-ই খুলে নিয়েছে মুসার মাস্ক। 'চুপ, কথা নয়। লম্বা লম্বা দম নাও। এক মিনিটেই ঠিক হয়ে যাবে।'

তা-ই করল মুসা। রোভারের পিঠে গাল রেখে চুপচাপ শুয়ে রইল। সহজ হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস। হাঁপাচ্ছে না আর। সেই ভয়ঙ্কর লাল অন্ধকারের ছায়াও নেই, সরে গেছে পুরোপুরি। কথা বলার ক্ষমতা ফিরে এল।

কিন্তু কোন প্রশ্ন করার আগে, কি হয়েছিল টিনহাকে জিজ্ঞেস করার আগে, আপনা-আপনিই একটা কথা বেরিয়ে এল অন্তর থেকে, 'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, রোভার।'

'তুমিও একদিন ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, মনে নেই?' রোভারের মাথায় হাত রাখল টিনহা। 'ও কিছু ভোলে না…'

পাশে চলে এসেছে বোট। হুইল ধরেছে কিশোর। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে রয়েছে উলফ।

'দেখেছি,' চেঁচিয়ে বলল সে, উত্তেজনায় জ্বলছে যেন টাক। 'মনিটরে দেখলাম, এক ঝলক। কিন্তু দেখেছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শ্যাটানোগার বোট।' কিশোরের দিকে ফিরে বলল, 'ধরে রাখো, নড়বে না। ঠিক আমাদের নিচেই রয়েছে। রোভার ওপরে ওঠার সময় আলো পড়ল, তখনই দেখলাম বোটটা। তাহলে…'

'এখন পারব না,' কড়া গলায় বাধা দিল টিনহা। 'মুসাকে আগে ডেকের ওপর তুলি, দেখি কি হয়েছে, কি গোলমাল।'

'কিন্তু…' রেলিঙে থাবা মারল উলফ।

'পরে,' কণ্ঠস্বর বদলাল না টিনহা। 'যান, গিয়ে হুইল ধরুন, কিশোরকে পাঠিয়ে দিন, সাহায্য দরকার।'

দ্বিধা করল উলফ। কিন্তু জানে, এখন সব কিছু টিনহার হাতে। এ-মুহূর্তে ওকে

চটানো উচিত হবে না। ওর সাহায্য ছাড়া বোট থেকে মালগুলো উদ্ধার করতে পারবে না। গোমড়া মুখে মাথা ঝাঁকাল সে, গিয়ে কিশোরের হাত মুক্ত করল।

মুসাকে বোটে উঠতে সাহায্য করল কিশোর আর টিনহা। এখনও দুর্বল লাগছে, ডেকেই বসে পড়ল মুসা। এক মগ গরম কফি এনে দিল টিনহা। ইতিমধ্যে বেল্ট খুলে এয়ার ট্যাংক আর অন্যান্য যন্ত্রপাতির বোঝা মুসার পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়েছে কিশোর।

'ও-কে,' জিজ্ঞেস করল টিনহা, 'এবার বলো, কি হয়েছিল। গোলমালটা কি ছিল? পানির চাপ না, এত গভীরে নামোনি। কি?'

'দম নিতে পারছিলাম না,' মগে চুমুক দিল মুসা, কফি খুব ভাল বানানো হয়েছে। 'টিউব দিয়ে বাতাস আসছিল না। ভাবলাম জট লেগেছে। কিন্তু লাগেনি।'

তার কি কি অসুবিধে হয়েছিল, জানাল মুসা। কি ভাবে চোখের সামনে রঙ বদলে গিয়েছিল, লাল হতে হতে কালো হয়ে গিয়েছিল, সে অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল গলা।

'কারবন-ডাই-অকসাইড,' বলল টিনহা। 'কারবন-ডাই-অকসাইড টানছিলে।'

এয়ার ট্যাংকটা টেনে নিয়ে ভালভ খুলল সে, হিসহিসিয়ে চাপ চাপ বাতাস বেরোল না।

'এজন্যেই শ্বাস নিতে পারোনি, বাতাসই নেই ট্যাংকে।'

'কিন্তু নামার আগে চেক করেছি,' বলল মুসা।

প্রেসার গজটা পরীক্ষা করল কিশোর। কাঁটা এখনও 'ফুল' নির্দেশ করছে। দেখাল টিনহাকে। 'কেউ গজ জ্যাম করে দিয়েছে। তারপর ট্যাংক থেকে বাতাস বের করে দিয়েছে।

একমত হলো টিনহা। এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।

'যন্ত্রপাতিগুলো কোত্থেকে এনেছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওশন ওয়ারল্ড। আমি নিজে এনে রেখেছি গতরাতে। সব কিছু ঠিকঠাক ছিল তখন।' উলফের কাছে গিয়ে দাঁড়াল টিনহা। 'মুসার ট্যাংকে গোলমাল কে করেছে? আমি জানতে চাই...'

'আমি কি জানি?' রেগে গেল উলফ। যন্ত্রপাতি আমি নষ্ট করতে যাব কেন? আমি কি গাধা, জানি না, গণ্ডগোল করে দিলে বোটের মাল তুলতে অসুবিধে হবে? এই যে দেরিটা হচ্ছে, ক্ষতি কি আমার হচ্ছে না? আমি শুধু চাই...' কি চায়, উত্তেজিতভাবে দ্রুত বলে গেল সে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অনেক শব্দ ভেঙে ফেলল, হাস্যকর করে তুলল কথাগুলো।

উলফের কথা বিশ্বাস করল কিশোর, সত্যি কথাই বলছে। মুসার ট্যাংক নষ্ট করে দিয়ে তাকে মেরে ফেললে উলফের কোন লাভ হবে না। জিজ্ঞেস করল, গতরাতে এই বোটে কেউ উঠেছিল? কিংবা আজ ভোরে?'

'না,' মাথা নাড়ল উলফ। 'ঘাটে বাঁধা ছিল। গতরাতে আমি বোটে ঘুমিয়েছি। টিনহা যাওয়ার পর একবারও নামিনি।'

'কেউ দেখা করতে এসেছিল?'

'না। শুধু আমার বন্ধু নীল বনেট। আমার সঙ্গে বসে হুইসকি খেয়েছে, কিন্তু

নীলকে আমি অবিশ্বাস করি না···'

'ওকে কতদিন থেকে চেনেন?' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'ও কে? ওর সম্পর্কে কি কি জানেন?'

'প্রশ্ন। বোকার মত খালি প্রশ্ন,' বিরক্তিতে মুখ বাঁকাল উলফ, টাকে খামচি মারল। 'এত কথা বলতে পারব না। যাও, গিয়ে বাক্সটা তোলো···'

'জবাব দিন,' কঠিন শোনাল টিনহার গলা, কোমরে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। 'যা যা জিজ্ঞেস করে, সব কথার জবাব দেবেন। নইলে ওই বোটের ধারেকাছে যাব না আমি।'

'ঠিক আছেহ্!' হাত নাড়ল উলফ, রাগ দমন করে বলল, 'কি জানতে চাও? নীলের সঙ্গে কতদিনের পরিচয়?'

মাথা নোয়াল কিশোর।

'কয়েক বছর। ইউরোপে দেখা হয়েছিল। ওখানে দুজনে···' দ্বিধা করল উলফ। 'কিছু ব্যবসা করেছি একসঙ্গে। তারপর আবার দেখা হয়েছে মেকসিকোতে।'

'কবে?'

'কয়েকবারই হয়েছে···'

'শেষবার যখন গিয়েছিলেন, হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। লা পাজে ছোটখাট ছাপাখানার ব্যবসা করছে। পুরানো দোস্ত, মেকসিকো গেলেই ওর সঙ্গে দেখা না করে ফিরি না। তাতে দোষের কি?'

নীরব রইল কিশোর, ভাবছে।

'আর কিছু জিজ্ঞেস করবে, কিশোর?' বলল টিনহা।

'না। আর কিছু না।'

'গুড,' টিনহার দিকে ফিরল উলফ। 'আবার কাজ শুরু করা যেতে পারে?'

'পারে। তবে আগে ভালমত আবার ট্যাংক-ফ্যাংকগুলো চেক করে নিই। মরতে চাই না।'

ডেকের ওপর নিজের যন্ত্রপাতিগুলো ফেলে রেখেছে টিনহা। গিয়ে ট্যাংকের ভালভ খুলল। এখান থেকেই বাতাসের হিসহিস শুনতে পেল কিশোর।

যে শয়তানী করেছে, সবগুলো যন্ত্র নষ্ট করার সময় পায়নি। কিংবা ইচ্ছে করেই করেনি। হয়তো ভেবেছে, মারাত্মক একটা দুর্ঘটনাই পুরো উদ্ধার কাজটা পর্যুদস্ত করে দেবে, ব্যর্থ করে দেবে।

টিনহার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'বাক্সটা উলফকে দেয়ার আগে ভেতরে কি আছে দেখতে চাই। আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

প্রস্তাবটা ভেবে দেখল টিনহা। 'ও-কে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল, 'তাই হবে।'

'থ্যাংকস।' তার ওপর টিনহার বিশ্বাস দেখে খুশি হলো কিশোর। তবে বিশ্বাস না করলে ভুল করত, কারণ এখন প্রায় সব প্রশ্নের জবাবই কিশোরের জানা।

জাম হওয়া প্রেসার গজ। উলফের পুরানো বন্ধু, নীল বনেট। লা পাজে ট্রিপ। বনেটের চোখের নিচের দাগ, কুঁচকানো চামড়া। ছড়ানো ছিটানো প্রতিটি টুকরো প্রশ্নের উত্তরই খাপে খাপে জোড়া লেগে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মনে।

# তেরো

'এত নিচে নামা সম্ভব না,' ককপিটে উলফের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে টিনহা। 'ওই বোট পর্যন্ত যেতে পারব না।'

'তাহলে···?'

'যা বলছি, শুনুন। রোভারকে দিয়ে কাজ করাতে হলে ফালতু একটা কথা বলবেন না। যা যা জিজ্ঞেস করব, বলবেন। সব ইনফরমেশন চাই। ও-কে?'

টিনহার চোখে চোখে চেয়ে রইল উলফ, লোকটার দৃষ্টিতে আগুন দেখতে পাচ্ছে কিশোর। 'আরও প্রশ্ন?···বেশ, কি জানতে চাও?'

'ঠিক কোন জায়গায়? ক্যালকুলেটর ভরা বাক্সটা আছে কোথায়?'

'হুঁ···' চোখ সরিয়ে নিল উলফ, টিনহার দিকে তাকাতে পারছে না। 'কেবিন। বাংকের তলায়।।'

'বাঁধা? আই মিন, কোন কিছুর সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে?'

'না,' উসখুস করছে উলফ। 'ভেলা ভাসাতে চেয়েছিল তোমার বাবা। তাহলে বাক্সটা সঙ্গে নিতে পারতাম। কিন্তু সময়ই পেলাম না। তার আগেই তলিয়ে গেল বোট,' তিক্ত হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর। 'বাক্স আর নিতে পারলাম না, জান বাঁচানোই মুশকিল হয়ে উঠল।'

'কেবিনের দরজায় তালা আছে?'

'নাহ্। তুমি তো জানোই···'

মাথা ঝাঁকাল টিনহা। বোটটার প্রতিটি ইঞ্চি চেনা তার। দশ বছর বয়েস থেকেই ওই বোটে করে মাছ ধরতে গিয়েছে বাবার সঙ্গে। 'জানি দরজা খোলা রাখত বাবা, যাতে ইচ্ছে হলেই চট করে গিয়ে ঢুকতে পারে। বীয়ারের প্রচণ্ড নেশা তো, দেরি সইতে পারে না।

'হ্যাঁ,' টিনহার দিকে তাকাতে পারল আবার উলফ।

'বাক্সটা দেখতে কেমন?'

'সবুজ রঙের। ইস্পাতে তৈরি। দু-ফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া, আর নয় ইঞ্চি পুরু।'

'হ্যানডেল আছে?'

'আছে।···বাক্সটা···ইয়ে, মানে, ক্যাশবক্সের মত দেখতে। ডালায় লাগানো হ্যাণ্ডেল।'

'হুঁ,' বাক্সটা কি করে বের করে আনবে ভাবছে টিনহা। 'দড়ি লাগবে। সরু, শক্ত দড়ি। আর একটা তারের কাপড় ঝোলানোর হ্যাঙ্গার।'

'যাচ্ছি,' বলল উলফ। 'কিশোর, হুইলটা ধরো তো।'

দড়ি আর হ্যাঙ্গার আনতে দেরি হলো না।

হ্যাঙ্গারটাকে বাঁকা করে চৌকোনা করে নিল টিনহা। বাঁকা হুকটা দাঁড়ানো রয়েছে একটা বাহুর ওপর। শক্ত নাইলনের দড়ির এক মাথা বাঁধল হ্যাঙ্গারের সঙ্গে।

'ও-কে, এবার যাওয়া যায়।'

মুসা এগিয়ে এল। 'আমি…' আর যেতে চায় না সে, যা ঘটে গেছে খানিক আগে, এরপর আজ আর পানিতে ডুব দেয়ার ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু একেবারেই কিছু না বললে ভাল দেখায় না, কিছু যদি মনে করে বসে টিনহা, তাই বলছে। 'আমিও যাব…'

হেসে তাকাল টিনহা। 'তুমি থাকো। দরকার হলে আসতে বলব।'

মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মুসা, হাসল। সরাসরি না বলে দিতে পারত টিনহা, তা না বলে ঘুরিয়ে বলেছে। এতে তার অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে মুসার। অঘটনটা ঘটার পর থেকেই নিজেকে দোষী ভাবছে, যদিও দোষটা মোটেই তার নয়।

দড়ির বাণ্ডিল কাঁধে ঝুলাল টিনহা, মাস্ক ঠিক করল, তারপর নেমে গেল আবার সাগরে।

কয়েক গজ দূরে ঝিমোচ্ছিল রোভার, শব্দ শুনে চোখ মেলল। এগিয়ে এল টিনহার দিকে।

রোভারের পিঠে চাপড় দিল টিনহা, পুরো এক মিনিট তার গায়ে গাল ঠেকিয়ে রইল।

মুসা দেখছে। বুঝতে পারছে, তিমিটার সঙ্গে কথা বলছে টিনহা। কিন্তু কি বলছে, শোনা যাচ্ছে না।

পরে অনেক ভেবেছে মুসা। কিন্তু কিছুতেই তার মাথায় আসেনি, কিভাবে কি করতে হবে, তিমিটাকে কি করে বুঝিয়েছে টিনহা। মানুষের মনের ঘোরপ্যাঁচ কি করে বুঝল একটা জন্তু!

মনিটরের দিকে চেয়ে আছে কিশোর।

সাদা আলোর চক্র ফুটল পর্দায়, রোভারের মাথার লাইট জ্বেলে দিয়েছে টিনহা। তীব্র আলোয় পানিকে দেখাচ্ছে ধোঁয়াটে সাদা মেঘের মত। ফুটে উঠল এক ঝাঁক রঙিন মাছ চোখে ভয়, দ্রুত সরে গেল ওগুলো।

আবার দেখা গেল সাগরের তলদেশ। নুড়ি আর বালিময় গোল একটুকরো জায়গার পাশে একটা পাথর, শামুক ছেয়ে আছে।

কিশোরের পেছনে হুইলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে উলফ, তার চোখও পর্দার দিকে। উত্তেজনায় সোজা হয়ে গেছে সে, না চেয়েও টের পেল কিশোর।

বোটের সামনের দিকটা খুঁজে পেয়েছে ক্যামেরার চোখ।

'ওই যে,' কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা, বলে উঠল উত্তেজিত কণ্ঠে।

বড় হচ্ছে বোটের গলুই, ভরে দিচ্ছে আলোর চক্র। হঠাৎ সরে গেল, গাড়ির পাশ দিয়ে যেভাবে সরে যায় থাম কিংবা গাছ, সেভাবে। ডেক দেখা গেল, এক ঝলকের জন্যে হুইলটা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, মেঘে ঢাকা পড়েছে সাদা চক্র। সরে গেল মেঘ, আগের চেয়ে উজ্জ্বল হলো আলো, স্পষ্ট হলো ছবি। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একটা চেয়ার, একটা পোর্টহোল।

সোজা কেবিনে ঢুকে পড়েছে রোভার।

কয়েক সেকেণ্ড পর্দায় এত তাড়াতাড়ি নানারকম আকৃতি ফুটল, ঝাঁকুনি খেলো

ছবি, কিছুই বোঝা গেল না। টানটান হয়ে গেছে উলকের স্নায়ু, উত্তেজনায় শক্ত হয়ে গেছে পেশী।

ছবির উন্মাদ নাচ ঝিমিয়ে এল এক সময়, স্থির হলো, স্পষ্ট হলো আবার। চেনা যাচ্ছে এখন। ধাতব বাক্সটা দেখা যাচ্ছে।

'ওটাই,' হুইলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে উলফ, মনিটরের পর্দা থেকে ছোঁ মেরে তুলে আনবে যেন।

বড় হচ্ছে বাক্সটা···আরও···আরও বড়, ভরে দিল আলোর চক্র, বাক্সের খুব কাছে চলে গেছে ক্যামেরার চোখ।

ভীষণভাবে দুলে উঠল বাক্সটা আচমকা, পরক্ষণেই হারিয়ে গেল। আর কিচ্ছু নেই পর্দায়, শুধু শূন্য গোল সাদা আলো।

ভ্রূকুটি করল কিশোর। ক্যামেরায় কোন গণ্ডগোল হলো? তারপর বুঝল, না ক্যামেরা ঠিকই আছে, নইলে আলো আসত না, আসলে সাদা দেয়ালের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে যন্ত্রটার চোখ। নিশ্চয় বাংকের নিচে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে রোভার।

কিছুক্ষণ প্রায় অনড় হয়ে রইল সাদা আলো, তারপর আবার দুলে উঠল। নানারকম অস্পষ্ট ছবি ঝড় তুলল আবার পর্দায়। কিশোরের মনে হলো, আবছাভাবে দেখতে পেয়েছে বোটের তামার রেলিঙ।

আবার আলোর সামনে ফুটল পরিচিত ধোঁয়াটে মেঘ। উঠে আসছে রোভার।

'আস্ত একটা গর্দভ জানোয়ার!' গলা কাঁপছে উলফের, হুইল এত জোরে চেপে ধরেছে সাদা হয়ে গেছে আঙুল। 'বাক্সটা তোলার চেষ্টাই করল না।' রাগে ঝটকা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল তীরের দিকে।

উলফের কথায় কান দিল না কিশোর। পলকের জন্যে পর্দায় একটা ব্যাপার দেখেছে, যা মিস করেছে লোকটা। ক্যামেরার চোখের সামনে অনেক বড় হয়ে ফুটেছিল একটা মানুষের হাত, নিশ্চয় টিনহার, সরে গেছে সঙ্গে সঙ্গেই। তার কয়েক মুহূর্ত পরই নিবে গেল গোল আলো। ক্যামেরা অফ করে দিয়েছে টিনহা।

'এই, হুইল ধরো,' মুসার বাহু ধরে টান দিল উলফ। 'সোজা রাখবে বোট, নড়ে না যেন।'

ছুটে ডেকে বেরোল উলফ, রেলিঙে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। তার পিছু নিল কিশোর, কিন্তু দাঁড়াল না, পাশ কাটিয়ে চলে এল বোটের পেছনে, লকারের কাছে। সাগরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। বিশ গজ দূরে ভেসে উঠল টিনহার মাথা। কাঁধে দড়ির বাণ্ডিলটা নেই, এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে।

টিনহার পাশে ভেসে উঠেছে রোভার। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করল কিশোর, ক্যামেরা আর সার্চলাইট নেই, তার জায়গায় বাঁধা রয়েছে সবুজ ধাতব বাক্সটা।

লকার খুলে মুসার লুকিয়ে রাখা প্লাসটিকের ব্যাগটা বের করল কিশোর। এক টানে ব্যাগের মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে বের করল একটা ওয়াকি-টকি। টেনে অ্যান্টেনা পুরো তুলে দিয়ে সুইচ অন করল।

যন্ত্রটা মুখের কাছে এনে জরুরী কণ্ঠে বলল, 'রবিন, প্লে করো! রবিন, প্লে করো!'

ফিরে তাকাল উলফের দিকে। রেলিঙে ঝুঁকে রয়েছে লোকটা, আর সামান্য ঝুঁকলেই উল্টে পড়ে যাবে পানিতে, এদিকে নজরই নেই।

'নিয়ে এসো!' চেঁচিয়ে বলল উলফ। 'বাক্সটা নিয়ে এসো। এই মেয়ে, শুনছ?'

'রবিন, প্লে করো!' আবার বলল কিশোর। 'রোভারের গান প্লে করো! রবিন, প্লে করো! রোভারের গান প্লে করো!'

## চোদ্দ

'শুনেছি, কিশোর! ওভার অ্যাণ্ড আউট!'

ওয়াকি টকির সুইচ অফ করে পাশের পাথরের ওপর রেখে দিল রবিন।

এখান থেকে উলফের বোট দেখা যাচ্ছে না। কতদূরে আছে, তা-ও বোঝার উপায় নেই। তবে তিমির শ্রবণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ, এটা জানা আছে, জেনেছে বই পড়ে। সাধারণ দৃষ্টিতে তিমির কান চোখে পড়ে না, কাছে গিয়ে ভাল করে দেখলে দেখা যাবে, চোখের ঠিক পেছনে সুচের ফোঁড়ের মত অনেকগুলো ছিদ্র।

রেডিওর স্পীকারের সামনে যেমন তারের জাল বা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়, তিমির কানও তেমনিভাবে ছিদ্রওয়ালা চামড়ায় ঢাকা। মানুষের কানের চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী কান। অসাধারণ আরেকটা ক্ষমতা আছে ওই কানের—সোনার সিসটেম, শব্দের প্রতিধ্বনি শুনেই বলে দিতে পারে, কি জিনিসে আঘাত খেয়েছে শব্দ, জিনিসটা কত বড় এবং কত দূরে আছে, একশো গজ দূর থেকেও সেটা নির্ভুলভাবে বুঝতে পারে তিমি। পানির নিচে একে অন্যের ডাক কয়েক মাইল দূর থেকেও শুনতে পায় ওরা।

তাড়াহুড়ো করে সোয়েটার আর জুতো খুলে নিল রবিন। বাতাস-নিরোধক বাক্সে ভরা টেপরেকর্ডারটা তুলে নিয়ে এসে নামল সাগরে। পানিতে ডুবিয়ে টিপে দিল প্লে করার বোতাম। ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল ক্যাসেটের চাকা, ফিতে পেঁচাচ্ছে। ফুল ভলিয়ুমে সাগরের পানিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে রোভারের রেকর্ড করা কণ্ঠ।

মানুষের কান সে শব্দ শুনতে পাবে না, কিন্তু রোভারের কানে হয়তো পৌঁছবে, অনেক দূর থেকেও।

বোটের পেছনে আগের জায়গায়ই রয়েছে কিশোর। তাড়াতাড়ি আবার লকারে লুকিয়ে ফেলল ওয়াকি-টকিটা।

বিশ গজ দূরে এখনও পাশাপাশি ভাসছে টিনহা আর রোভার। বাক্সটা নিয়ে আসার জন্যে থেমে থেমে চেঁচিয়েই চলেছে উলফ।

হাত তুলে সিগন্যাল দিল কিশোর। আগেই বলে রাখা আছে টিনহাকে, এর অর্থ ঃ রবিনকে খবর পাঠানো হয়েছে।

হাত নেড়ে জবাব দিল টিনহা ঃ বুঝতে পেরেছে। রোভারের মাথায় আলতো চাপড় দিল। এক সঙ্গে ডাইভ দিল দুজনে।

রেলিঙে সোজা হলো উলফ। 'কি হচ্ছে? হচ্ছেটা কি?' চেঁচিয়ে উঠে দৌড়ে

গিয়ে ককপিটে ঢুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল মুসাকে। বনবন করে হুইল ঘুরিয়ে বোটের নাক ঘুরিয়ে দিল একটু আগে টিনহা আর রোভার যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে।

জায়গাটায় প্রায় পৌঁছে গেছে বোট, এই সময় মাথা তুলল টিনহা। বোট থামিয়ে হুইল আবার মুসার কাছে ফিরিয়ে দিল উলফ। 'ধরে রাখো,' বলেই ছুটে বেরোল ককপিট থেকে।

'বাক্সটা কোথায়?' রেলিঙে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল উলফ।

জবাব দিল না টিনহা। এক হাতে ক্যামেরা আর সার্চ লাইট, আরেক হাতে রেলিঙ ধরে উঠছে পানি থেকে।

'তিমিটা কোথায়?' আবার বলল উলফ।

তবু জবাব নেই। ধীরে সুস্থে মাস্ক খুলল টিনহা, এয়ার ট্যাংকটা পিঠ থেকে খুলে রাখল ডেকে।

'কোথায়?' রাগে লাল হয়ে গেছে উলফের মুখ। 'বাক্স কোথায়? তিমি কোথায়?'

'আমারও সেই প্রশ্ন, মিস্টার উলফ,' সাগরের দিকে চেয়ে বলল টিনহা।

'মানে?' পাই করে কিশোরের দিকে ফিরল উলফ। 'এই বিনকিউলার নিয়ে তুমি কি করছ? দেখি, আমাকে দাও।'

বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে সাগরে আঁতিপাতি করে তিমিটাকে খুঁজল সে।

রোভারের চিহ্নও নেই।

'তিমির স্বভাবই ওরকম,' বোঝানোর চেষ্টা করল টিনহা। উলফ এদিকে পেছন করে আছে। কিশোরের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে চোখ টিপল টিনহা। 'সঙ্গে আছে, আছে, হঠাৎ করে হাওয়া। একেবারে গায়েব। মুক্তির নেশায় পেয়ে বসে, না কী, কে জানে। যায় তো যায়ই, আর আসে না।'

বিনকিউলার চোখ থেকে সরাল উলফ। 'হারামজাদা আমার বাক্স নিয়ে গেছে। ওটার মাথায় বেঁধেছিল কেন?' টিনহার দিকে তাকাল, চোখে সন্দেহ। 'কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল টিনহা, মুখ বাঁকাল হতাশ ভঙ্গিতে। 'উপায় ছিল না। আর কোনভাবে তুলে আনতে পারতাম না। ভাল কাজ দেখিয়েছে, এটা তো অস্বীকার করতে পারবেন না। কেবিনে ঢুকে কি সহজেই না বাংকের তলা থেকে বাক্সটা বের করে আনল। হ্যাঙ্গারটা মুখে করে নিয়ে গিয়ে হ্যাণ্ডেলে হুক লাগিয়ে টেনে বের করে আনল বাক্স। তারপর দড়ি ধরে টেনে তুলেছি আমি···'

'বোটে আনলে না কেন?'

'বোকার মত কথা বলবেন না। অনেক নিচে নেমে, অনেকক্ষণ পানিতে ডুবে থেকেছি, ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এরপর ভারি একটা বোঝা নিয়ে সাঁতরে···'

'তত ভারি নয় বাক্সটা···'

'তবু খামোকা কথা বলছেন।' উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে দু-হাত রাখল টিনহা। 'ইস্পাতের একটা বাক্স, ভেতরে ক্যালকুলেটর বোঝাই, ভারি নয় তো কি হালকা? রোভারের মাথায় বেঁধে আনাটাই তো সহজ, নাকি?' রেলিঙে ঝোলানো তোয়ালে তুলে নিয়ে চুল মুছতে শুরু করল সে। খারাপ কি আমারও কম লাগছে? আপনার

কেমন অর্ধেক গেছে, আমারও তো গেছে।'

'গেছে না!' উলফের কণ্ঠে তিক্ত হতাশা। বিনকিউলারটা আবার চোখে লাগাল। 'কোথায়? কোথায়, পাজি, নচ্ছাড়, হারামীর বাচ্চা হারামী, পোকাখেকো জানোয়ারটা? গেল কোথায় বেঈমান মাছটা?'

কিশোরের দিকে চেয়ে নিরীহ গলায় বলল টিনহা, 'কিশোর, কোথায় গেল, বলতে পারো?'

'হয়তো পারি,' দ্রুত ভাবনা চলেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মাথায়। পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে, পুরোদমে এঞ্জিন চালালেও পিছু নিয়ে ওটাকে এখন ধরতে পারবে না উলফ। তার আগেই তীরে পৌঁছে যাবে রোভার। রবিন একলা রয়েছে খাঁড়ির ধারে, তার হয়তো সাহায্য দরকার হতে পারে। 'শুধুই অনুমান। আমার মনে হয় তীরে চলে গেছে রোভার, খাঁড়ির দিকে। ওখানেই তো সকালে সাগরে নামানো হয়েছিল তাকে।

ঝট করে বিনকিউলার নামিয়ে ফিরে চাইল উলফ। চোখে সন্দেহ। 'কেন তা করতে যাবে?'

বাড়ি ফেরার প্রবণতা,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'বলেইছি তো, মিস্টার উলফ, এটা আমার অনুমান।'

'ওঁম্‌ম্‌...' তীরের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল উলফ। 'যাও, গিয়ে হুইল ধরো। খাঁড়ির দিকে চালাও।'

সামনের ডেকে চলে এল উলফ।

মুসার হাত থেকে হুইল নিল কিশোর।

'ফুল স্পীড!' আদেশ দিল উলফ।

'আই আই, স্যার,' দারুণ মজা পাচ্ছে কিশোর, খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। পুরো বাড়িয়ে দিল এঞ্জিনের গতি। নষ্ট হলে উলফের হবে, তার কি? সে তো আদেশ পালন করছে মাত্র। তবে খাঁড়িতে তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর ব্যাপারে উলফের চেয়ে কম উদ্বিগ্ন নয় সে। দেখতে চায়, তার প্ল্যানমাফিক সব হয়েছে কিনা। নিজের গাওয়া গানের প্রতি সাড়া দিয়ে সত্যিই তীরে ছুটে গেছে কিনা রোভার। সবার আগে বাক্সটা খুলতে চায় কিশোর। দেখতে চায়, কি আছে ভেতরে!

# পনেরো

হাতের ওয়াটারপ্রুফ ঘড়ির দিকে তাকাল রবিন। পঁচিশ মিনিট।

পঁচিশ মিনিট ধরে রোভারের গান বাজাচ্ছে সে। আর পাঁচ মিনিট পরেই শেষ হয়ে যাবে ফিতে, আবার শুরুতে পেঁচিয়ে এনে তারপর প্লে করতে হবে।

পানিতে নেমে উবু হয়ে পানির নিচে ধরে রেখেছে বাক্সটা। একবার এ-পায়ের ওপর ভর রাখছে, একবার ও-পায়ের ওপর। পা নাড়াতেই হচ্ছে, নইলে যা ঠাণ্ডা পানি, জমে যেতে চায়। বাঁকা হয়ে থাকতে থাকতে কোমর ধরে যাচ্ছে।

সামান্য সোজা হলো রবিন। এই সময় দেখতে পেল তীর থেকে শ-খানেক গজ দূরে স্থির পানিতে মৃদু নড়াচড়া, নিচ দিয়ে বড় কিছু একটা আসছে, ওখানকার পানি

অস্থির। সত্যিই দেখছে তো, নাকি কল্পনা?

না, সত্যিই দেখছে। আবার দেখা গেল নড়াচড়া। এবার বেশ জোরে। উত্তেজনায় পা নড়াতে ভুলে গেল রবিন। সাগরের দিকে চেয়ে আছে, চোখে পলক পড়ছে না।

সবার আগে চোখে পড়ল ধাতব বাক্সটা। রবিনের মাত্র কয়েক ফুট দূরে ভেসে উঠল। মুহূর্ত পরেই ভুসস করে ভাসল রোভারের মাথা। নিঃশব্দে ভেসে চলে এল রবিনের কাছে, হাঁটুতে নাক ঘষল।

'রোভার! রোভার!' ঠাণ্ডার তোয়াক্কাই করল না রবিন, ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে, তিমিটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। 'রোভার, দিয়েছ কাম সেরে।'

রবিনকে দেখে রোভারও খুশি। শরীর উঁচু করে, লেজের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে উঠেছে।

'সরি, রোভার,' আন্তরিক দুঃখিত মনে হলো রবিনকে, 'তোমাকে ধোঁকা দিয়েছি।'

ভাবছে সে—পথের শেষে কি দেখবে আশা করেছিল তিমিটা? আরেকটা তিমি? নিজের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছিল? নাকি স্রেফ কৌতূহল? দূরে নিজের কণ্ঠ শুনলে রবিনের যে-রকম লাগবে, তেমনি কোন ব্যাপার?

'কিছু মনে কোরো না, রোভার। লক্ষ্মী ছেলে। দাঁড়াও তোমার লাগাম খুলে দিই, তারপর খুশি করে দেব তোমাকে।'

সকালে আসার সময় এক বালতি মাছ নিয়ে এসেছে টিনহা।

কয়েক সেকেণ্ডেই রোভারের লাগাম খুলে নিল রবিন, বাক্সটা খুলে নিল। আরে, বেশ ভারি তো! তবে আরও অনেক ভারি হবে মনে করেছিল সে। 'দাঁড়াও এখানে। আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি।'

দু-হাতে বাক্সটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে ঘুরল সে, উঠে আসতে শুরু করল পানি থেকে।

শুকনো বালিতে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় চোখে পড়ল লোকটাকে। সৈকতের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে এদিকেই চেয়ে আছে।

লম্বা, গায়ে উইণ্ডব্রেকার, চোখের ওপরে নামিয়ে দিয়েছে হ্যাট। প্রথমেই লোকটার কাঁধ দৃষ্টি আকর্ষণ করল রবিনের। তারপর অস্বাভাবিক মোটা বাহু।

এগিয়ে আসতে শুরু করল লোকটা। অবাক কাণ্ড! মুখ কোথায়? আরও কাছে আসার পর বোঝা গেল, মাথার ওপর দিয়ে নাইলনের কালো মোজা টেনে দিয়েছে।

'গুড,' বলল লোকটা। 'দাও, কেসটা দাও।' কেসটা উচ্চরণ করল 'কেস-আস'।

চেনা কণ্ঠস্বর, আগেও শুনেছি রবিন, এই লোকই ফোন করেছিল তাদেরকে, একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। কিশোরকে কিডন্যাপ করেছিল। মুসা এর পেটে গুঁতো মেরেই চিত করে ফেলেছিল মড়মড়ে কাঠের মেঝেতে।

'দাও,' হাত বাড়াল লোকটা। দ্রুত এগিয়ে আসছে, মাত্র দুই গজ দূরে রয়েছে।

চুপ করে রইল রবিন। কি বলবে? বাক্সটা আরও শক্ত করে বুকে চেপে ধরে

পিছিয়ে আসতে শুরু করল।

'দাও।' গতি বাড়াল লোকটা।

হাঁটু পানিতে চলে এসেছে রবিন। লোকটাও কাছে এসে গেছে। থাবা দিয়ে বাক্সটা ছিনিয়ে নিতে গেল।

আরও পিছানোর চেষ্টা করল রবিন, কিন্তু তার আগেই বাক্স ধরে ফেলল দৈত্যটা। রবিনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইল।

বাক্স ছাড়ল না রবিন, বুঝতে পারছে, লাভ হবে না। লোকটার বুক আর বাহুর আকার দেখে হতবাক হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে পারবে না সে।

কিন্তু সহজে বাক্স ছাড়ল না। টানাহেঁচড়া চলল, পিছিয়ে আসছে সে ধীরে ধীরে। কোমর পানিতে চলে এল। লোকটা তার গায়ের ওপর এসে পড়েছে। চাপ আরেকটু বাড়লেই চিত হয়ে পড়ে যাবে, তার ওপর পড়বে দৈত্যটা। তখন আর বাক্স না ছেড়ে পারবে না।

ভারসাম্য হারাল রবিন। ওই অবস্থায়ই দেখতে পেল, উঠতে শুরু করেছে লোকটার শরীর। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে শূন্যে উঠে পড়ল, চার হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে ঝপাস করে পড়ল পানিতে। তার নিচেই দেখা গেল তিমির প্রকাণ্ড মাথা।

ঝাড়া মেরে আবার লোকটাকে শূন্যে তুলে ফেলল রোভার। অতি সহজে। টেনিস বল লোফালুফি করছে যেন বাচ্চা ছেলে। বার বার ছুঁড়ে মেরে তাকে নিয়ে চলল গভীর পানির দিকে।

চেঁচাচ্ছে দৈত্যটা, সাহায্যের জন্যে। পানিতে দাপাদাপি করছে, ভেসে থাকার চেষ্টায়।

আবার লোকটার পিঠের নিচে মাথা নিয়ে গেছে রোভার, শূন্যে ছুঁড়বে আবার। চেঁচামেচিতে থমকে গেল। পানি থেকে মাথা তুলে স্থির দৃষ্টিতে দেখল এক মুহূর্ত, তারপর তীরের দিকে ঠেলে আনতে শুরু করল লোকটাকে।

ভেসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে লোকটা, পারছে না। বুকে যেন জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, ভারের চোটে তলিয়ে যাচ্ছে পানিতে। হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে ফল হচ্ছে না।

এই খানিক আগেও পরম শত্রু ভেবেছিল লোকটাকে রবিন। কিন্তু এখন দুঃখ হচ্ছে তার জন্যে। তার ডুবে মরা দেখতে পারবে না চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে।

সৈকতে উঠে এক দৌড়ে এসে একটা পাথরের আড়ালে আগে বাক্সটা লুকাল সে। তারপর আবার ছুটে ফিরে এসে নামল পানিতে।

এতক্ষণে প্রায় ডুবেই গেছে লোকটা। পানির ওপরে রয়েছে শুধু মোজায় ঢাকা মুখ। তার পাশে ভাসছে রোভার। চোখে বিস্ময়।

'ওর নিচে ঢোকো, রোভার,' রবিন বলল। 'ভাসিয়ে রাখতে পারো কিনা দেখো।'

তিমিটা তার কথা বুঝল কিনা কে জানে, কিন্তু রবিন যা বলল ঠিক তা-ই করল। না বললেও বোধহয় করত। তিমি আর ডলফিনের স্বভাব এটা—ডুবন্ত মানুষকে ঠেলে তুলে তীরে পৌঁছে দিয়ে যাওয়ার অনেক কাহিনী আছে। দৈত্যটার বিশাল বুক ভেসে উঠল পানির ওপরে। খামচে টেনে উইণ্ডব্রেকারটা ছিঁড়ে ফেলার

চেষ্টা করছে। পারছে না। চেন খোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো।

লোকটাকে ঠেলে কাছে নিয়ে এল রোভার।

চেন খুলে অনেক টানাটানি করে লোকটার গা থেকে উইণ্ডব্রেকার খুলে আনল রবিন। অবাক হয়ে গেল। এতক্ষণে বুঝল, কিসের ভারে ডুবে যাচ্ছিল লোকটা। উইণ্ডব্রেকারের ভেতরের দিকে ফোম-রবারের পুরু আস্তরণ, স্পঞ্জের মত পানি শুঁষে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, ভীষণ ভারি।

উইণ্ডব্রেকার খুলতেই লোকটার আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। হালকা-পাতলা দুর্বল একজন মানুষ, বেচারার দুরবস্থা দেখে করুণা হচ্ছে রবিনের। রোভারের সাহায্যে পানির একেবারে কিনারে নিয়ে এল লোকটাকে। তারপর ঠ্যাং ধরে টেনে এনে ফেলল বালিতে।

চিত হয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে লোকটা। এত কাহিল, ওঠার ক্ষমতা নেই। হ্যাট খুলে পড়ে গেছে পানিতে। মাথার ওপর টেনে দেয়া মোজাটা রয়েছে।

টেনে মোজা খুলল রবিন।

বেরিয়ে পড়ল লম্বা, ধারাল নাক। সামান্য বসা গাল। ডান চোখের নিচে কুঁচকানো দাগ।

নীল বনেট।

# ষোলো

'ওই,' চেঁচাল উলফ, 'ওই জানোয়ারটা।' জানোয়ারকে বলল জান-ওয়ার।

চোখ থেকে বিনকিউলার সরিয়ে কিশোরকে বলল সে, 'ঠিকই আন্দাজ করেছ। ব্যাটা ওখানেই ফিরে গেছে।' তাড়াতাড়ি ককপিটে এসে কিশোরকে সরিয়ে হুইল ধরল।

টিনহাও দেখেছে রোভারকে। রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে সে। ডাকল, 'রোভার! এই রোভার!'

ডাক শুনে সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলল রোভার। ছুটে আসতে শুরু করল।

'বাক্স কই?' বকের মত মাথা বাড়িয়ে দেখছে উলফ। 'বাক্সটা কই?'

তীরের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। বালিতে পড়ে আছে একটা লোক, তার পাশে দাঁড়ানো রবিন। এদিকেই চেয়ে রয়েছে সে। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাথা ঠেকিয়ে গোল করে দেখিয়ে ইঙ্গিত দিল ঃ সব ঠিক আছে।

'তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার,' মুসাকে ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'উলফ কিছু বোঝার আগেই।'

'ঠিকই বলেছ,' ওয়েট স্যুট খোলেনি মুসা। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরাতে শুরু করল।

জামা খুলে কিশোরও পানিতে নামল, সাঁতরে চলল তীরের দিকে।

'আরে, নীল বনেট!' হাত দিয়ে গায়ের পানি মুছতে মুছতে বলল কিশোর। 'ও কি করছিল এখানে? রবিন, কি ব্যাপার?'

সংক্ষেপে সব জানাল রবিন। সব শেষে বলল, 'মরেই গিয়েছিল আরেকটু হলে। শরীরে কিচ্ছু নেই, একেবারে কাহিল।'

কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে তাকাল কিশোর। তীরের যতটা সম্ভব কাছে বোট নিয়ে এসেছে উলফ। নোঙ্গর ফেলেছে। রোদে চকচক করছে টাক। উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে লাফিয়ে নামল পানিতে।

'বাক্সটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'লুকিয়ে ফেলেছি...' উলফকে দেখে চুপ হয়ে গেল রবিন।

নীল বনেটের দিকে তাকালই না উলফ। ওকে এখানে দেখে বিন্দুমাত্র অবাক হয়নি। ছেলেদের কাছে এসে রবিনকে বলল 'বাক্সটা কোথায়?'

জবাব দিল না রবিন।

'এই ছেলে, তোমাকে বলছি,' খেঁকিয়ে উঠল উলফ। 'বাক্সটা দাও।'

'কিসের বাক্স?' আকাশ থেকে পড়ল যেন রবিন। কনুই দিয়ে আলতো গুঁতো দিল মুসার শরীরে। উলফের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ইঙ্গিত। তার ইচ্ছে, মুসা লোকটাকে আটকে রাখতে পারলে দৌড়ে গিয়ে বাক্স নিয়ে সাইকেলে করে পালিয়ে যাবে।

ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে ধমকে উঠল উলফ, 'খবরদার! কোন চালাকি নয়।' কোমর পর্যন্ত ভেজা তার। খাটো ডেনিম জ্যাকেটে পানি লাগেনি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। আবার যখন বের করল, হাতে দেখা গেল ভোঁতা নাক ছোট একটা পিস্তল, কুৎসিত চেহারা।

রবিনের দিকে পিস্তল তাক করল উলফ। 'বাক্স। তিমিটা নিয়ে এসেছে। দাও, কেই-আসটা, জলদি।'

অসহায়ভাবে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

কিশোর চেয়ে আছে পিস্তলের দিকে। আগ্নেয়াস্ত্রের ওপরে পড়াশোনা মোটামুটি করছে। উলফের হাতে ওটা কোন্ কোম্পানির চিনতে পারল না, তবে ব্যারেলের আকার দেখে অনুমান করল, নিশানা মোটেই ভাল হবে না অস্ত্রটার। দশ গজ দূর থেকেও ওটা দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করা কঠিন হবে। কিন্তু উলফ ধরে রেখেছে রবিনের বুকের এক ফুট দূরে।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'দিয়ে দাও বাক্সটা।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। মুখ কালো, এত কষ্ট করে লাভ হলো না। পাথরের কাছে এসে দাঁড়াল। তার পেছনেই রয়েছে উলফ। বাক্সটা তুলল রবিন। নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল উলফ।

'না-আ-আ-আ!' তীক্ষ্ণ চিৎকার।

প্রথমে বুঝতে পারল না রবিন চিৎকারটা কোথা থেকে এসেছে। তারপর দেখল, এলোমেলো পায়ে দৌড়ে আসছে বনেট।

ঘুরে চেয়েছে উলফ। চিৎকারে সে-ও অবাক হয়েছে।

রবিনের মাত্র কয়েক গজ দূরে রয়েছে কিশোর, মাথা নেড়ে ইশারা করল। বাক্সটা ছুঁড়ে দিল রবিন। লুফে নিল কিশোর।

উলফকে গাল দিতে দিতে আসছে বনেট, 'বেঈমান! হারামী! মিথ্যুক! চোর!'

রবিন আর কিশোরের দিকে নজর দেয়ার আগেই উলফের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বনেট। আঙুল বাঁকা করে খামচি মারতে গেল চকচকে টাকে, গলা চেপে ধরতে গেল। পিস্তল নামিয়ে ফেলেছে উলফ, কনুই দিয়ে পেটে গুঁতো মেরে বনেটকে গায়ের ওপর থেকে সরানোর চেষ্টা করল, এপাশ-ওপাশ সরাচ্ছে মাথা।

ধাক্কা খেয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল বনেট, কিন্তু উলফের জ্যাকেট ছাড়ল না, তাকে নিয়ে পড়ল।

বাক্সটা কিশোরের হাতে। মুসা দাঁড়িয়ে আছে দশ গজ দূরে, পানির কিনারে। আরেকটু দূরে পানিতে রোভারের গায়ে গা ঠেকিয়ে দেখছে টিনহা।

মুসার কাছে বাক্সটা ছুঁড়ে দিল কিশোর।

ঝাড়া দিয়ে জ্যাকেট ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল উলফ। আবার কাহিল হয়ে গেছে বনেট, দুর্বল পায়ে উঠে দাঁড়াল সে-ও।

বাক্সটা ধরেছে মুসা। টিনহার দিকে তাকাল।

বুঝতে পারল টিনহা। তীরের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল।

বাক্সটা দু-হাতে বুকে ঝাপটে ধরে টিনহার দিকে ছুটল মুসা। ছুটতে শুরু করেছে উলফ। চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়াও! দাঁড়াও, বলছি।'

কে শোনে তার কথা? ফিরেও তাকাল না মুসা। বুঝতে পারছে, তার দিকেই চেয়ে আছে উলফের পিস্তল, কিন্তু তোয়াক্কা করল না।

'দাও,' হাত বাড়াল টিনহা। 'ছুঁড়ে মারো।'

বাসকেট বল খেলে মুসা, ভালই খেলে। ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গেল উলফের কথা। ভুলে গেল, যে কোন মুহূর্তে গর্জে উঠতে পারে পিস্তল। বাক্সটাকে বাসকেট বলের মত করে ধরে দূর থেকে ছুঁড়ে দিল টিনহার দিকে, বল ছোঁড়ার কায়দায়।

লম্বা ধনুক সৃষ্টি করে উড়ে গেল বাক্সটা, কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে সেটা ধরল টিনহা।

বাক্সটা ছুঁড়ে দিয়েই আর দেরি করেনি মুসা, ঝাঁপ দিয়েছে পানিতে। ডুবে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ভাসল না। পানির নিচ দিয়েই সাঁতরে চলল গভীর পানির দিকে। দম একেবারে ফুরিয়ে এলে, ভাসল।

বিশ গজ দূরে চলে গেছে টিনহা। তীরের দিকে চেয়ে আছে। বাক্সটা কামড়ে ধরে রেখেছে রোভার।

মাথা নিচু করে রেখে ফিরে চাইল মুসা।

পিস্তল নেই উলফের হাতে, বোধহয় পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে। টেকো মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে। মুসার মনে হলো, ভয়ানক রেগে গিয়ে ফুঁসছে একটা ষাঁড়, কি করবে বুঝতে পারছে না। তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে কিশোর আর রবিন।

হাত নেড়ে মুসাকে ডাকল কিশোর।

পানি থেকে উঠে এল মুসা।

'...আপনার জিনিস ডাকাতি করার কোন ইচ্ছেই নেই আমাদের, মিস্টার উলফ,' কিশোর বলছে। 'বাক্সের জিনিস অর্ধেক আমাদের, মানে, মিস শ্যাটানোগার প্রাপ্য। সেটা নিশ্চিত করার জন্যেই একাজ করেছি।'

অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না উলফ। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। ভুরু নাচাল, 'কি করতে চাইছ?'

'বাক্সটা শহরে নিয়ে যাব,' বলল কিশোর। 'থানায়, ইয়ান ফ্লেচারের অফিসে। উনি এখানকার পুলিশ চীফ, জানেন বোধহয়। খুব ভাল লোক। পুলিশকে ভয়ের কিছু নেই, বেআইনী কিছু করেননি, আমাদেরকে পিস্তল দেখানো ছাড়া। সেকথা বলব না আমরা। সব খুলে বলবেন তাঁকে। মিস্টার ফ্লেচার বাক্সের জিনিসগুলো ভাগাভাগি করে দেবেন আপনাকে আর টিনহাকে।'

আবার দীর্ঘ নীরবতা। সাগরের দিকে তাকাল উলফ। পাশাপাশি ভাসছে টিনহা আর রোভার। ওদের কাছ থেকে বাক্সটা ফেরত নেয়ার কোন উপায় নেই। পিস্তল তাক করেও কোন লাভ হবে না, বিচ্ছু একেকটা, কেয়ারই করবে না। উল্টে আরও বেকায়দা অবস্থায় ফেলে দিতে পারে তাকে।

'বেশ,' ভোঁতা গলায় বলল উলফ। 'বোটে করে যাব আমরা। রকি বীচের নৌকাঘাটায় বোট রেখে থানায় যাব। ঠিক আছে?'

রাজি হলো না কিশোর, মাথা নাড়ল। উলফের চালাকি বুঝতে পারছে, কিন্তু সেকথা বলল না। নরম গলায় বলল, 'এত ঘুরে যাওয়ার দরকার কি? আসলে এখান থেকে যাওয়ারই দরকার নেই। চীফকেই ডেকে নিয়ে আসতে পারি আমরা।'

'ডেকে? কিভাবে?' ষাঁড়ের মত ফোঁস ফোঁস করে উঠল উলফ। 'এখানে ফোন কোথায়? সব চেয়ে কাছেরটাও...'

'...আধ মাইল দূরে,' কথাটা শেষ করে দিল কিশোর, 'কোস্ট রোডের ধারে একটা কাফেতে। সাইকেল নিয়ে পাঁচ-সাত মিনিটেই চলে যাবে রবিন। চীফকে ফোন করে আসবে। কি রবিন, পারবে না?'

'খুব পারব,' হাসল রবিন।

'মিস্টার উলফ, আপনার পিস্তলটা যদি বোটে রেখে আসেন,' মোলায়েম গলায় বলল কিশোর, 'টিনহাকে বাক্সটা আনতে বলতে পারি। তারপর রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি পুলিশ আসার অপেক্ষায়। কি বলেন?'

কি আর বলবে উলফ? 'কোঁকড়াচুলো, সাংঘাতিক পাজি, ইবলিসের দোসর' ছেলেটাকে কষে দুই চড় লাগানোর ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল সে। চোখ পাকিয়ে তাকাল 'অতি নীরিহের' ভান করে থাকা মুখটার দিকে। কিন্তু কিছুই করার নেই।

পুলিশকে ফোন করতে গেল রবিন।

বোটের লকারে পিস্তলটা রেখে এল উলফ। মুসা আবার গিয়ে দেখে এল, সত্যিই রেখেছে কিনা।

তীরে এসে মাছের বালতিটা নিয়ে গেল টিনহা, রোভারকে খাওয়াল। তাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে এল তিমিটা, তীরের কাছে এসে মাথা তুলে চেয়ে রইল, টিনহাকে চলে যেতে দেখে খারাপ লাগছে তার।

এতক্ষণে খেয়াল করল কিশোর, বনেট নেই। কোথাও দেখা গেল না তাকে। কেটে পড়েছে কোন এক ফাঁকে।

পথের ধারে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদের, রবিন ফিরে এল।

কয়েক মিনিট পরেই পুলিশের গাড়ি। আরও পনেরো মিনিট পর থানায় পৌঁছল ওরা।

ওদের দিকে চেয়ে অবাকই হলেন ইয়ান ফ্লেচার। তাঁকে দোষ দিতে পারল না কিশোর, কাদা-পানিতে যা চেহারা হয়েছে ওদের একেকজনের, পোশাক-আশাকের যা অবস্থা, তাতে তিনি অবাক না হলেই বরং অস্বাভাবিক লাগত।

'কি ব্যাপার কিশোর?' জানতে চাইলেন পুলিশ-প্রধান।

তিন গোয়েন্দাকে চেনেন তিনি। কয়েকবার পুলিশকে সাহায্য করেছে ওরা। বেশ কয়েকটা জটিল কেসের সমাধান করে দিয়েছে। কিশোরের বুদ্ধির ওপর যথেষ্ট আস্থা তাঁর।

উলফকে দেখিয়ে বলল কিশোর, 'উনি মিস্টার উলফ। উনিই বলুন সব, সেটাই ভাল হবে।'

'বলুন, মিস্টার উলফ,' অনুরোধ করলেন ফ্লেচার।

উঠে দাঁড়াল উলফ। পকেট থেকে ভেজা কাগজপত্র বের করে তা থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা নিয়ে বাড়িয়ে ধরল।

লাইসেন্সটা একজন সহকারীকে দিলেন ক্যাপ্টেন, পরীক্ষা করে দেখার জন্যে।

সব খুলে বলল উলফ। মেকসিকোয় ক্যালকুলেটর চোরাচালান করতে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে ফেরার পথে ঝড়ে বোট ডোবা, তারপর তিমির সাহায্যে বাক্সটা উদ্ধার, কিছুই বাদ দিল না। কিশোরকে দেখিয়ে বলল, 'আমার এই খুদে বন্ধুটি পরামর্শ দিল, বাক্সটা আপনার সামনে খুলতে। তাতে আমার আর মিস্টার শ্যাটানোগার ভাগ নিয়ে পরে কোন গোলমাল হবে না। ভেবে দেখলাম ঠিকই বলেছে। রাজি হয়ে গেলাম।'

পকেট থেকে বাক্সের চাবি বের করে ক্যাপটেনকে দিল উলফ। 'টিনহা, বাক্সটা দাও ক্যাপটেনের কাছে।'

মনে মনে স্বীকার না করে পারল না কিশোর, অভিনয় মোটামুটি ভালই করেছে উলফ। যেন নিরীহ সৎ একজন মানুষ। কারও সঙ্গে বেঈমানী করতে চায় না। মিস্টার শ্যাটানোগার প্রাপ্য ভাগ দিতে বিশেষ আগ্রহী।

তালা খুলে বাক্সের ডালা তুললেন ক্যাপটেন। কুঁচকে গেল ভুরু।

টিনহা চমকে গেল। রবিন আর মুসার চোখ দেখে মনে হলো, হঠাৎ সার্চ লাইটের তীব্র উজ্জ্বল আলো ফেলেছে কেউ তাদের চোখে।

ধীরে সুস্থে এগিয়ে এল কিশোর, উঁকি দিয়ে দেখল বাক্সের ভেতরে কি আছে। সামান্যতম অবাক মনে হলো না তাকে, যেন জানত এ-জিনিসই থাকবে।

দশ ডলারের কড়কড়ে নতুন নোটের বাণ্ডিলে ঠাসা বাক্সটা।

রবার ব্যাণ্ড দিয়ে বেঁধে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিশোর অনুমান করল, দশ লাখ ডলারের কম হবে না।

'তো, দেখলেন তো চীফ,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল উলফ। 'লা পাজে এবারের ট্রিপে যা আয় হয়েছে, আছে এখানে। সেই সঙ্গে...' টেলিফোন বেজে ওঠায় থেমে গেল।

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ শুনলেন মিস্টার ফ্লেচার। নামিয়ে রেখে বললেন, 'আপনার আই ডি চেক করা হয়েছে। পরিষ্কার। আপনার

নামে কোথাও কোন ওয়ারেন্ট নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলেন, সেই সঙ্গে কি?'

'পকেট ক্যালকুলেটরগুলো লা পাজে বিক্রি করে দিয়েছিলাম, সেই টাকা আছে এখানে। সেই সঙ্গে রয়েছে আমার অন্য টাকা। লা পাজে আমার কিছু সম্পত্তি ছিল, একটা হোটেল ছিল, সব বিক্রি করে দিয়ে এসেছি। সেই টাকা। এখন টিনহা বলুক, তার বাবার ক্যালকুলেটরগুলোর জন্যে কত চায়।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপটেন। 'আপনার বিরুদ্ধে কোন কেস দাঁড় করাতে পারছি না। ট্যাক্স যদি ক্লিয়ার থাকে...' শ্রাগ করলেন তিনি। 'মিস শ্যাটানোগা, বলুন কত চান?'

হাসল টিনহা। 'বুঝতে পারছি না। মিস্টার উলফ বলেছিলেন, বাক্সে ক্যালকুলেটর রয়েছে, পঁচিশ-তিরিশ হাজার ডলার দাম। মিছে কথা কেন বলেছিলেন, জানি না। যাক গে। বাবার অর্ধেক শেয়ার হয় সাড়ে বারো থেকে পনেরো হাজার কিন্তু তুলতে খরচাপাতি লেগেছে। হাসপাতালের বিল হাজার দশেক লাগবে, ওটা পেলেই আমি খুশি।'

'ঠিক আছে, দশ হাজারই দেব,' বাক্সটা তুলে নেয়ার জন্যে সামনে ঝুঁকল উলফ। 'কাল সকালে চেক দিয়ে দেব তোমাকে। কালই টাকা তুলে নিতে পারবে ব্যাংক থেকে।'

এখান থেকে নগদ নয় কেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না টিনহা, সঙ্কোচে।

বাক্সটা টেবিলের ওপর দিয়ে টেনে আনল উলফ। ডালা আটকাবে। তারপর বেরিয়ে যাবে এতগুলো টাকা নিয়ে।

এক কদম সামনে বাড়ল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিল, হাত সরিয়ে ক্যাপটেনকে বলল, 'স্যার, ছোট্ট একটা অনুরোধ আছে।'

চাবিটা উলফকে দিতে গিয়েও থেমে গেল ক্যাপটেনের হাত। 'কি?'

'বাক্সটা আবার খুলুন। নোটের সিরিয়াল নাম্বার মেলান।'

'সিরিয়াল?'

'মেলান। আমার ধারণা, একই নাম্বারের অনেকগুলো পাবেন।' বলতে বলতেই টান দিয়ে নিজেই নিয়ে এল বাক্সটা। ডালা তুলে একটা বাণ্ডিল বের করে ঠেলে দিল ক্যাপটেনের দিকে। 'আর, ট্রেজারিতে ফোন করুন, এক্সপার্ট পাঠাক। সব জাল নোট, আমি শিওর।'

# সতেরো

'সহজেই নীল বনেটকে ধরে ফেলেছে পুলিশ,' বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে তাঁর বিশাল টেবিলের সামনে বসে বলছে কিশোর। 'ওর ঝরঝরে লিমোসিনে করে মেকসিকো পালাচ্ছিল। পথে খারাপ হয়ে যায় গাড়ি। স্যান ডিয়েগোর কাছে। পুলিশের কাছে সব বলে দিয়েছে ও।'

চেয়ারে হেলান দিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'বনেট স্বীকার করেছে জাল নোটগুলো সে বানিয়েছে?'

'করেছে,' জবাব দিল রবিন। 'শুধু তাই না। মিস শ্যাটানোগার গাড়ির ব্রেকের কানেকশন কেটেছে। যত ভাবে পেরেছে, ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে আমাদেরকে, যাতে বাক্সটা না তুলতে পারি। লোকটার জন্যে এখন আমার দুঃখই হচ্ছে। বেচারা।...আসলে উলফ তাকে বাধ্য করেছিল নোট জাল করতে। বনেট তার ব্ল্যাকমেলের শিকার।'

'ব্ল্যাকমেল? কিভাবে?'

'ইউরোপে কাজ করত বনেট। পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স আরও নানা রকম দরকারী কাগজপত্র জাল করত। সেটা জেনে ফেলল পুলিশ। উলফও জানল। বনেটের কাজকর্মের কিছু প্রমাণও জোগাড় করে ফেলল। পালাল বনেট। মেকসিকোতে গিয়ে ঢুকল। মনস্থির করল, আর বেআইনী কাজ করবে না। তার যা দক্ষতা, প্রেসের কাজে উন্নতি করতে পারবে। তা-ই করল সে, লা পাজে প্রেস দিল। ভালই চলছিল, এই সময় একদিন সেখানে গিয়ে হাজির হলো উলফ। দেখা হয়ে গেল বনেটের সঙ্গে। নোট জাল করতে বাধ্য করল তাকে। ভয় দেখাল, তার কথা না শুনলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে।'

'হুঁ, মাথা নাড়লেন চিত্রপরিচালক। 'কিশোর, তুমি কি করে বুঝলে নোটগুলো জাল?'

'বনেটের চোখের নিচের দাগ, স্যার,' বলল কিশোর। 'কারা কারা ঘড়ির মেকানিকের গ্লাস পরে, ভাবলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, লেখা কিংবা নকশা জালিয়াতির কাজ যারা করে, তারাও পরে।'

'আমার হলে মনে পড়ত না,' স্বীকার করলেন পরিচালক। 'অনেক তলিয়ে ভাব তুমি। যাক, বাক্সটা তুলতে বাধা দিল কেন বনেট, নিশ্চয় তার জাল করা সমস্ত নোট ছিল ওটাতে? ডুবে গিয়েছিল বলে খুব খুশিই হয়েছিল সে, না?'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'টাকাগুলো ছড়িয়ে পড়লে তার অপরাধ আরও বাড়ত। বোট ডুবে যাওয়ায় খুশি হয়েছিল সে, সেজন্যেই ওটা তুলতে বাধা দিচ্ছিল। উলফ জানত না। একজন তুলতে চাইছে, আরেকজন বাধা দিচ্ছে, ব্যাপারটায় প্রথমে খুব অবাক হয়েছিলাম।' থামল কিশোর। তারপর বলল, 'আপনার জানা আছে, স্যার, প্রতিটি জালিয়াতের কাজে কিছু না কিছু ফারাক থাকেই, বিশেষজ্ঞের চোখে ধরা পড়ে সেটা। বনেটও জানত, টাকাগুলো ব্যাংক থেকে পাবলিকের কাছে যাবে, সেখান থেকে কিছু যাবে ট্রেজারিতে, ট্রেজারির চোখে ধরা পড়ে যাবে ওগুলো জাল। জালিয়াতকে খুঁজতে শুরু করবে ওরা। এক সময় না এক সময় বনেটের কাছে পৌঁছে যাবেই।'

'বানাতে গেল কেন তাহলে? মানা করে দিলেই পারত।'

'ভয়ে। মুখের ওপর উলফকে না করতে পারেনি, কিন্তু বোটটা ডুবে যাওয়ার পর ওগুলো যাতে আর তোলা না যায়, সে ব্যবস্থা করতে চেয়েছে। শেষ দিকে মরিয়া হয়ে উঠেছিল সে।'

'হুঁ। অপরাধবোধ সঠিক চিন্তা করতে দেয় না মানুষকে। দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলে। কিন্তু বনেটই বাধা দিচ্ছে তোমাদেরকে, শিওর হলে কি করে?'

'অনেক সময় লেগেছে, স্যার। তিনজনকে সন্দেহ করলাম। বিংগো উলফ, নীল

বনেট, আর যে লোকটা একশো ডলার পুরস্কার দেবে বলেছে তাকে।' রবিনের দিকে তাকাল সে। 'বনেটের মাথা থেকে সেদিন সৈকতে মোজা খোলার আগেতক বুঝতে পারিনি, সে-ই বাধা দিয়েছে।'

মাথা দোলালেন চিত্রপরিচালক, 'হুঁ উলফের ওপর তোমাদের নজর ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যেই ওভাবে কথা বলেছে বনেট। টেনে টেনে ভেঙে ভেঙে বলেছে, গোয়ে-ন্দা, কেই-আস...'

'বেই-অ্যাও,' হাসল কিশোর। 'পাকা জালিয়াত লোকটা, অভিনয়ও ভাল করে। যেভাবে উলফের কথা নকল করল, বেশ দ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল আমাদেরকে।'

'তোমরা তিন গোয়েন্দা, সেটা জানল কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'স্যান পেড্রোতে দেখেই নাকি চিনেছিল?'

'রোভারকে যেদিন বাঁচালাম, সেদিন বোটে উলফের সঙ্গে বনেটও ছিল,' বলল কিশোর। 'তিমিটাকে বাঁচিয়েছি, দেখেছে ওরা। তিমিটার সাহায্যে বোটের মাল তোলার কথা বলল তাকে উলফ, পুরো প্ল্যানটা বলল। তখনই ঠিক করে ফেলেছে বনেট, পরদিন ওশন ওয়ারল্ডে যাবে। ওখানে দেখল আমাদেরকে। আগের দিন সৈকত দেখেছিল, পরদিন ওশন ওয়ারল্ডে আমাদের দেখে ধরে নিল তিমিটার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেই গেছি আমরা। টিনহার অফিসে ঢুকতে দেখল, পরে টিনহার টেবিল আমাদের কার্ডটা দেখল। তার ধারণা হলো, আমাদেরকে দিয়েই তার কাজ হবে, ঠেকাতে পারবে উলফকে। তিমিটা সাগরে ছেড়ে দিতে পারলেই আর বোটের মাল তোলা যাবে না।'

'তিমি ছেড়ে দিলেও হয়তো অন্য উপায় বের করত উলফ,' বললেন চিত্রপরিচালক। 'এতগুলো টাকা, পুরো এক মিলিয়ন ডলার। আচ্ছা, ম্যারিবু শ্যাটানোগার অফিসে ঢুকেছিল কেন বনেট? নিশ্চয় একটা নকল চাবি বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ঢুকল কেন?'

'শ্যাটানোগার স্কুবা যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট করতে। ওশন ওয়ারল্ড থেকে যন্ত্রপাতি ধার নিল টিনহা। বেকায়দায় পড়ে গেল বনেট। শেষে উলফের বোটে উঠে কোনমতে একটা যন্ত্র নষ্ট করতে পারল।'

'আর সেটা পড়ল মুসার ভাগে,' মুচকি হাসলেন পরিচালক। 'মুসা, তোমার কপালই খারাপ।'

'হ্যাঁ, স্যার,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'আরেকটু হলেই দিয়েছিল শেষ করে।'

ঘড়ির দিকে তাকালেন পরিচালক। 'আরিব্বাবা, অনেক বেজেছে। লাঞ্চের সময়। আরে বসো বসো, তোমাদের জন্যেও আনতে বলছি। এখানেই খেয়ে যাও।' আড়চোখে তাকালেন মুসার হাসি হাসি মুখের দিকে, একটু আগের গোমড়া কুচকুচে কালো মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল।

বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে খাবার আনতে বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। রবিনের দিকে ফিরলেন। 'রবিন, টিনহার বাবার কি খবর? ভদ্রলোক সেরে উঠেছেন? হাসপাতালের টাকার কি ব্যবস্থা?'

'ভালা, স্যার,' রবিন জবাব দিল। 'তবে টাকার ব্যবস্থা পুরোপুরি হয়নি।

এতবড় একটা জালিয়াতি ধরিয়ে দেয়ার জন্যে আমাদেরকে ছোটখাটো একটা পুরস্কার দিয়েছে ট্রেজারি। আমাদের ভাগেরটাও টিনহাকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, তার বাবার চিকিৎসার জন্যে, নেয়নি। তার ভাগেরটাই শুধু নিয়েছে। আশা করছে, কেস করে ক্যালকুলেটর বিক্রির অর্ধেক টাকা আদায় কবরে উলফের কাছ থেকে।'

'ভাবছি,' সামনে ঝুঁকলেন চিত্রপরিচালক, 'তোমাদের এবারের কেসটা নিয়ে ছবি করব। ভাল কাহিনী। নামটা কি দেয়া যায়?'

'লস্ট হোয়েল,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা।

'নাহ,' মাথা নাড়ল রবিন। 'লস্ট ওয়ারল্ড লস্ট ওয়ারল্ড মনে হয়। তাছাড়া তিমিটাকে তো আবার পাওয়া গেছে।'

'কিডন্যাপড হোয়েল,' বিড় বিড় করল কিশোর। বাংলায় বলল, হারানো তিমি।

'ঠিক,' আঙুল তুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'কিডন্যাপড হোয়েল। চমৎকার নাম।'

খাবার এল। সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল বেয়ারা।

'নাও, শুরু করো,' বলতে বলতে নিজের প্লেটটা টেনে নিলেন পরিচালক। খাওয়ার সময় আর বিশেষ কথা হলো না। শূন্য প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে বললেন তিনি, 'কফি?'

ঘাড় কাত করল কিশোর। মুসা আর রবিনও সায় দিল।

'আচ্ছা,' কাপে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন পরিচালক। 'রোভারের কি খবর? চলে গেছে?'

'নড়েওনি,' হেসে বলল রবিন। 'তাকে যেখানে রেখে এসেছিল টিনহা, থানা থেকে ফিরে গিয়ে দেখল, ওখানেই রয়েছে। ঘোরাঘুরি করছে। টিনহার বড় বেশি ভক্ত হয়ে পড়েছে। ভেবেচিন্তে আবার নিয়ে এসেছে ওটাকে।'

'কোথায়? ওশন ওয়ারল্ডে?'

'হ্যাঁ।'

'গুড,' চেয়ারে হেলান দিলেন আবার পরিচালক। 'টিনহার উপকার করা যায় কিভাবে, ভাবছিলাম। ছবিতে ওকে আর রোভারকে দিয়েই অভিনয় করাতে পারি। দুজনের বেশ কিছু সম্মানী পাওনা হয় তাহলে আমার কাছে।'

তিনজনেই তাকিয়ে আছে পরিচালকের দিকে।

'হাজার দশেক অগ্রিমও দিতে পারি,' আবার বললেন তিনি।

'টিনহার বাবার বিলের টাকা হয়ে যায় তাহলে!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'কিশোর, বসে আছ কেন? চলো জলদি, টিনহাকে খবরটা দিতে হবে না? চলো, চলো।'

চিত্রপরিচালককে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে দরজার দিকে রওনা দিল তিন কিশোর।

হাসিতে ভরে উঠল মিস্টার ক্রিস্টোফারের কুৎসিত মুখ। হাসলে আর তত খারাপ দেখায় না তাঁকে।

***